গার্হস্থ্য জৈব আবর্জনার মধ্যে মূলত তরিতরকারি ও ফলমূলের খোসা, খাদ্যবিশেষ ইত্যাদি পড়ে এমন পৌরনিকাশি জল ও নালা-নর্দমার আবর্জনা বোঝায়। শিল্পজাত জৈব আবর্জনা বলতে বোঝায় খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ সংস্থার বর্জ্য ও নিকাশি জল। আর কৃষিজাত আবর্জনা বলতে মূলত উদ্ভিদের বর্জ্য অংশ ও পশুখামার থেকে পাওয়া গবাদিপশুর মল বোঝায়। তাই বলা যায় এই অবায়বীয় জীর্ণকরণ প্রক্রিয়ায় মিথেন উৎপাদন শুধুমাত্র শক্তি উৎপাদনের জন্য নয়, দূষণ নিয়ন্ত্রণেও এর একটা বিরাট ভূমিকা আছে।

c. বায়োফুয়েল :

বায়োফুয়েল বলতে বোঝায় উদ্ভিদ বা অণুজীবের মধ্যে আত্তীকরণ হওয়া কার্বনঘটিত যৌগ থেকে তৈরি জ্বালানি। শর্করা বা স্টার্চসমৃদ্ধ আখ বা ভুট্টা থেকে সন্ধান প্রক্রিয়ায় বায়োইথানল (আসলে ইথাইল অ্যালকোহল) তৈরি হয়। বিদেশে বহু জায়গায় গ্যাসোলিনের সঙ্গে এটা মিশিয়ে যানবাহন চালানো হয়।

উদ্ভিজ্জ তেল অথবা প্রাণীর চর্বি থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বায়োডিজেল তৈরি করা হয়। এটিও যানবাহন চালানোয় ডিজেলের বিকল্প জ্বালানি। আধুনিক গবেষণায় পাওয়া তথ্য থেকে দেখা যায় যে কিছু শ্যাওলা জাতীয় অথবা অন্যান্য অণুজীবও প্রোটিন থেকে জৈবজ্বালানি বা বায়োফুয়েল তৈরি করতে সক্ষম। আমাদের দেশে জৈব জ্বালানি (বায়োফুয়েল) উৎপাদন বলতে প্রধানত জ্যাট্রোফা গাছ চাষ ও তার বীজ থেকে তৈরি তেলের প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বায়োডিজেল তৈরিকেই বোঝায়। আমাদের দেশেরই প্রত্যন্ত এলাকায় বা জঙ্গলের কাছাকাছি থাকেন এমন মানুষেরা বহুযুগ ধরেই জ্যাট্রোফার তেল ব্যবহার করে আসছেন। পরিশোধন না করেই জ্যাট্রোফার তেল ডিজেল জেনারেটর বা ইঞ্জিনে ব্যবহার করা যায়। যেহেতু এই গাছ চাষের জন্য শুকনো বা চাষের প্রায় অযোগ্য জমিই যথেষ্ট, তাই অন্যান্য জৈব জ্বালানি, ভুট্টা বা আখ থেকে পাওয়া অ্যালকোহল অথবা পাম অয়েল, ডিজেল ইত্যাদির তুলনায় এর উৎপাদন ভারতের মতো দেশের পক্ষে অর্থনৈতিকভাবে খুবই লাভজনক হতে পারে। একইসঙ্গে বহু মানুষের কর্মসংস্থানও হতে পারে।

(vi) কঠিন আবর্জনা (Solid Waste) :

বর্তমানে পৃথিবীর বহু শহরে কঠিন আবর্জনা পুড়িয়ে স্টিম এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। অবশ্য এক্ষেত্রে বায়ুদূষণের দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

(vii) পারমাণবিক শক্তি :

পরমাণুর গঠন জানতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে নিউট্রন আর প্রোটনগুলো একটা শক্তি দিয়ে আবদ্ধ থাকে। তাকে নিউক্লীয় বন্ধনশক্তি বলে। যদি পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে বিশেষ একটা প্রক্রিয়ায় ভাঙা যায় তবে প্রচুর শক্তি বেরিয়ে আসে। এই শক্তিকে কাজে লাগাতে পারলেই বিদ্যুৎ পাওয়া

যায়। এভাবেই তৈরি হয়েছে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো। বিদেশে তো বটেই আমাদের দেশের মধ্যে মহারাষ্ট্রের তারাপুর, কেরলের কালাপক্কম, তামিলনাড়ুর কুড়ানকুলাম, গুজরাতের কাকরাপাড় ইত্যাদি জায়গায় ইতিমধ্যেই উৎপাদন শুরু হয়ে গেছে। আরো অনেক জায়গায় কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। 2032 সাল নাগাদ আমাদের দেশে 63000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। কিন্তু রাশিয়ার চেরনোবিল বা জাপানের ফুকুসিমার দুর্ঘটনা থেকে হওয়া তেজস্ক্রিয় দূষণের বিপদের কথা মাথায় রেখে আমাদের এবিষয়ে অত্যন্ত সতর্কভাবে পা ফেলা জরুরি। সাধারণ মানুষের কাছে পরমাণু বিদ্যুৎ এখনও ঠিক গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

জ্বালানির দহনে পরিবেশের ওপর ক্ষতিকারক প্রভাবসমূহ :

উত্তরোত্তর জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি পরিবেশের ওপর নানারকম কুপ্রভাব ফেলে।

1. কাঠ, কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি জ্বালানি দহন থেকে অদাহ্য (Unburnt) কার্বন কণা পরিবেশে মিশে যায়। এগুলো অ্যাজমা(হাঁপানি)-র মতো শ্বাসজনিত রোগ সৃষ্টি করে।

2. কম অক্সিজেনে এই সমস্ত জ্বালানির অসম্পূর্ণ দহনে কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয় যা অত্যন্ত বিষাক্ত গ্যাস। তাই বন্ধ ঘরে কাঠ বা কয়লা পোড়ানো খুবই ক্ষতিকারক। তাই বন্ধ ঘরে কাঠ বা কয়লা জ্বালিয়ে কোনো মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে মারাও যেতে পারেন।

3. অধিকাংশ জ্বালানির দহনের ফলে পরিবেশে কার্বন, সালফার ও নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড মিশে যায়। এইভাবে পরিবেশে CO_2 বেড়ে যাওয়াই বিশ্ব-উষ্ণায়নের প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত হয়েছে।

4. কয়লা ও ডিজেল পোড়ালে সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়, যা একটা ক্ষয়কারী (Corrosive) ও অত্যন্ত শ্বাসরোধী গ্যাস। আবার পেট্রোল ইঞ্জিন থেকে নাইট্রোজেনের একাধিক গ্যাসীয় অক্সাইড উৎপন্ন হয়। বৃষ্টির জলে সালফার ও নাইট্রোজেনের অক্সাইড গুলে গিয়ে অ্যাসিড উৎপন্ন করে। একেই অ্যাসিড বৃষ্টি বলা হয় যা শস্য, ঘরবাড়ি ও মাটির পক্ষে ক্ষতিকারক।

তাই পেট্রোল, ডিজেলের মতো জ্বালানির বদলে যানবাহনে CNG ব্যবহার করা শুরু হয়েছে, কারণ CNG থেকে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ ক্ষতিকারক পদার্থ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ CNG একটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার (Cleaner) জ্বালানি।

জ্বালানি ব্যবহার, দূষণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে তোমার মতামত লেখো।

কার্বন ডাইঅক্সাইড

কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাতাসে এক শতাংশেরও কম বলে তা বলে ভেবো না কার্বন ডাইঅক্সাইড কোনো কাজে লাগে না। আগেই আমরা কার্বন চক্রে পড়েছি প্রকৃতিতে কী কাজে লাগে কার্বন ডাইঅক্সাইড। এবার আমরা রাসায়নিক শিল্পেও কার্বন ডাইঅক্সাইডের কিছু ব্যবহারের কথা জানব।

রাসায়নিক শিল্পে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ব্যবহার

রাসায়নিক কারখানায় প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড। কীসে লাগে লক্ষ লক্ষ টন কার্বন ডাইঅক্সাইড?

1. ইউরিয়া তৈরি :

ফসল ফলাতে চাই নাইট্রোজেনঘটিত রাসায়নিক সার। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত নাইট্রোজেনঘটিত সার হল ইউরিয়া। কার্বন ডাইঅক্সাইড আর অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়ায় ইউরিয়া তৈরি করা হয়।

$$CO_2 + 2NH_3 \xrightarrow[\text{150 atm চাপ}]{200^o\ C} \underset{\text{ইউরিয়া}}{CO(NH_2)_2} + H_2O$$

2. কাচ তৈরি :

কাচ ছাড়া আজকের সভ্যতা অচল — আয়না, চশমার কাচ, অণুবীক্ষণ, ক্যামেরা, টেলিস্কোপের লেন্স, ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি পরীক্ষাগারের নানারকম যন্ত্রপাতি, গাড়ি বা জানালার কাচ, বালব, টিউবলাইট, ঘড়ির কাচ, ওষুধের শিশি ..... কাচ ছাড়া কিছুই হবে না। এত কাচ তৈরিতে সোডা (Na_2CO_3) চাই। ওই সোডা তৈরিতে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড লাগে।

3. অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র এবং কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রস্তুতিতে :

নানান ধরনের পানীয় তৈরিতে আর আগুন নেভাতে কার্বন ডাইঅক্সাইড লাগে, যদিও তেল ও ধাতু ঘটিত আগুনে এটা ব্যবহার করা যায় না। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সাধারণ তাপমাত্রায় প্রায় 60 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে তরলে পরিণত হয়। এই তরল কার্বন ডাইঅক্সাইডের ওপর থেকে হঠাৎ চাপ কমালে তরল কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রুত বাষ্পায়িত হতে চায়। এর ফলে তরল কার্বন ডাইঅক্সাইড কঠিনে পরিণত হয়। এই কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইডকে শুষ্ক বরফ বলা হয়। কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড খুব ঠাণ্ডা (-78^o C), তাই খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।

সারা পৃথিবীর বাতাসে CO_2-র মোট পরিমাণ যথেষ্ট হলেও 100 ভাগ ওজনের বাতাসে তা আছে 1 ভাগেরও কম। বুঝতেই পারছ বাতাস থেকে CO_2 সংগ্রহ করে তাই দিয়ে রাসায়নিক শিল্প গড়া সম্ভব নয়। তোমরা নীচে কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ লক্ষ করো যেখানে ধাতব কার্বনেট বা বাইকার্বনেট থেকে বিভিন্ন ভাবে CO_2 গ্যাসটি উৎপন্ন করা হয়েছে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণগুলো শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সাহায্যে পূরণ করে সমতাবিধান করো। এই বিক্রিয়ার কোন কোন শর্ত CO_2 উৎপন্ন হওয়া প্রভাবিত করতে পারে তা তোমরা শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের সারণিতে লেখো।

A. ধাতব কার্বনেট বা বাইকার্বনেটের সঙ্গে লঘু অ্যাসিডের বিক্রিয়া দ্বারা CO_2 গ্যাস উৎপাদন :

(i) $PbCO_3 + 2HNO_3 = Pb(NO_3)_2 + CO_2 + H_2O$

(ii) $CaCO_3 + 2HCl =$ ______ $+ CO_2 + H_2O$

(iii) $Na_2CO_3 + H_2SO_4 =$ _______ $+ CO_2 + H_2O$

(iv) $MgCO_3 +$ ______ $= MgCl_2 + CO_2 +$ _______

(v) $NaHCO_3 + HCl = NaCl +$ ____ $+ H_2O$

$PbSO_4$, $PbCl_2$ ও $CaSO_4$ জলে অদ্রাব্য। $PbCO_3$-র সঙ্গে লঘু HCl বা H_2SO_4 ব্যবহার করে কি দ্রুত CO_2 গ্যাসটি পাওয়া যেতে পারে? ....।

B. ধাতব কার্বনেট বা বাইকার্বনেটকে তাপ প্রয়োগ করে CO_2 গ্যাস উৎপাদন

(i) $CaCO_3 \xrightarrow{\text{উচ্চ তাপমাত্রা}(1000^o C)} CaO + CO_2$

(ii) $2NaHCO_3 \xrightarrow{\text{তাপ}} Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$

(iii) $PbCO_3 \xrightarrow{\text{উচ্চ তাপমাত্রা}}$ _______ + _______

(iv) $Ca(HCO_3)_2 \xrightarrow{\text{সাধারণ তাপমাত্রা}}$ _______ + _______ + _______

(v) $Mg(HCO_3)_2 \xrightarrow{\text{সাধারণ তাপমাত্রা}} MgCO_3 + CO_2 + H_2O$

$Ca(HCO_3)_2$ এবং $Mg(HCO_3)_2$ কঠিন অবস্থায় পাওয়া যায় না। তাই এদের জলীয় দ্রবণকে উত্তপ্ত করা হয় CO_2 গ্যাস উৎপাদনের জন্য। এইসব বাইকার্বনেট লবণ বাতাসের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় CO_2 গ্যাস নির্গত করে ধাতব কঠিন কার্বনেট লবণে পরিণত হয়।

C. কার্বনকে বাতাসে পোড়ালেও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় : $C + O_2 = CO_2$

নীচের শর্তগুলো কীভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপাদনকে প্রভাবিত করতে পারে তা সারণিতে লেখো

কার্বনেট/বাইকার্বনেট কঠিন বলে তাকে বেশি সংখ্যায় টুকরো করলে	কার্বনেট/বাইকার্বনেটের জলীয় দ্রবণের গাঢ়ত্ব পরিবর্তন করলে	কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত অ্যাসিডের গাঢ়ত্বের পরিবর্তন করলে	বিক্রিয়ার তাপমাত্রা বাড়ালে / কমালে

তাহলে তোমরা দেখলে ধাতব কার্বনেট, বাইকার্বনেটকে ব্যবহার করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত করা যায়। এবার তোমরা জানবে পরীক্ষাগারে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস তৈরি করা হয়।

পরীক্ষাগারে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রস্তুতি

প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য:
মার্বেল পাথর ($CaCO_3$) ও
লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl)
প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম: উলফ বোতল, দীর্ঘনল ফানেল, নির্গমনল, গ্যাসজার

আগের পৃষ্ঠায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রস্তুতির ছবি দেওয়া আছে।

এবার তুমি ওই ছবিটি ভালো করে লক্ষ করো এবং কীভাবে পরীক্ষাগারে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করা যায় তা নীচের সারণিতে লিখে রাখো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

কী করবে	কী দেখবে	কেন এমন হয়
		$CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + CO_2 + H_2O$ কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসের চেয়ে ভারী বলে গ্যাস-জারের ভেতরের বাতাসকে সরিয়ে জারের মধ্যে জমা হতে পারে।

ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$) বা ক্যালশিয়াম নাইট্রেট ($Ca(NO_3)_2$) জলে দ্রাব্য। তাই লঘু HCl বা HNO_3 অ্যাসিডদুটি $CaCO_3$-র সঙ্গে বিক্রিয়া করে CO_2 উৎপন্ন করতে পারে। কিন্তু H_2SO_4 নিয়ে পরীক্ষা করলে প্রথমে সামান্য CO_2 গ্যাস বেরোবার পর বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ $CaCO_3$-র সঙ্গে লঘু H_2SO_4 বিক্রিয়ায় উৎপন্ন ক্যালশিয়াম সালফেট ($CaSO_4$) জলে খুব একটা দ্রাব্য নয়। তাই মার্বেলকুচির উপর $CaSO_4$-এর পাতলা আস্তরণ পড়ে যায়। ফলে মার্বেলকুচি আর অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসতে না পারার জন্য বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

কার্বন ডাইঅক্সাইডের নানান ধর্ম

ভৌত ধর্ম : কার্বন ডাইঅক্সাইড বর্ণহীন, বাতাসের চেয়ে ভারী একটা গ্যাস। জলে খানিকটা দ্রাব্য। কার্বন ডাইঅক্সাইডের ধর্মগুলো বুঝতে নীচের পরীক্ষাগুলো লক্ষ করো।

1. কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসের চেয়ে ভারী:

পরীক্ষা 1

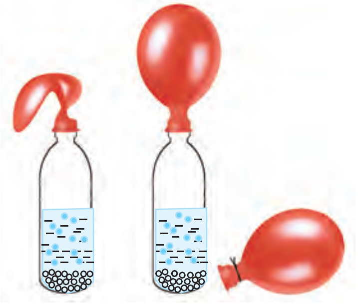

একটা রবারের বেলুন নেওয়া হলো। নীচের ছবির মতো করে একটা বোতলের মুখে তাকে রাবার ব্যান্ড দিয়ে আটকানো হলো। বোতলে গুঁড়ো খাবার সোডার মধ্যে ভিনিগার (অ্যাসেটিক অ্যাসিড দ্রবণ) ঢালা হয়েছে।

(i) একটু পরে তুমি বেলুনটার কী পরিবর্তন দেখবে?

(ii) এবার বেলুনটাকে খুলে নিয়ে যদি তার মুখটাকে বেঁধে দাও তবে দেখবে বেলুনটা হাওয়ায় ভেসে থাকছে না, টেবিলে পড়ে থাকবে। এ থেকে বোঝা যায় কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসের চেয়ে ________।

(iii) যদি বেলুনটায় হাইড্রোজেন ভরা হতো তাহলে কী হতো?

পরীক্ষা 2

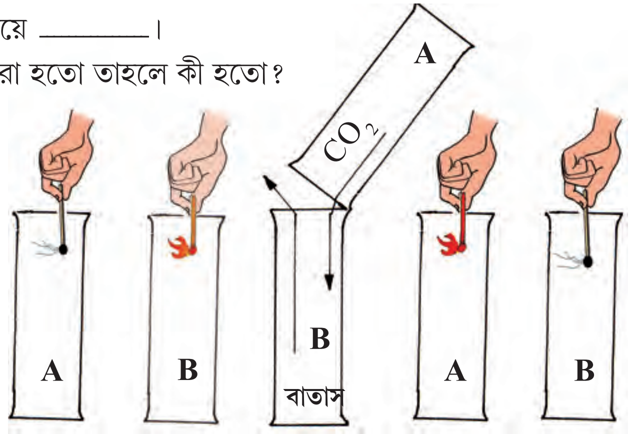

কী করলে	কী দেখলে	কেন এমন হলো
1. 2 নং পরীক্ষার ছবির মতো A ও B গ্যাসজার নাও। A গ্যাসজার কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দ্বারা পূর্ণ এবং B গ্যাসজারে বাতাস আছে। A ও B গ্যাসজারের ভিতর জ্বলন্ত পাটকাঠি ধরো। 2. এবার উপরের ছবির মতো করে B গ্যাসজারের উপর A গ্যাসজার উপুড় করে ধরো। কিছুক্ষণ পর আবার A ও B গ্যাসজারের ভিতর জ্বলন্ত পাটকাঠি ধরো।	1. A ও B গ্যাসজারের মধ্যে জ্বলন্ত পাটকাঠির অবস্থা কী হলো। ....। 2. A ও B গ্যাসজারের মধ্যে জ্বলন্ত পাটকাঠির অবস্থা কী হলো। ....।	1. .... 2. ....

2. কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস জলে দ্রবীভূত হয় :

হাতেকলমে

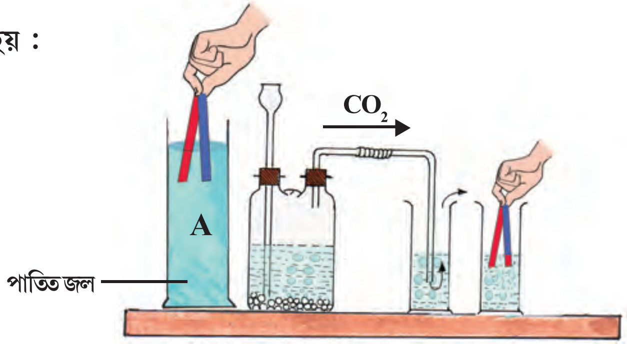

কী করলে	কী দেখলে	কেন এমন হলো
1. উপরের ছবির মতো A গ্যাসজারের ছবির মতো করে পাতিত জল নাও। ওই জলের মধ্যে লাল লিটমাস ও নীল লিটমাস কাগজ যোগ করো। 2. উলফ বোতল থেকে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গম নলের মাধ্যমে A গ্যাসজারের জলের মধ্যে ছবির মতো করে পাঠাও। বেশ কিছুক্ষণ জলের মধ্যে বুদবুদ ওঠার পর গ্যাসজারের জলের মধ্যে লাল ও নীল লিটমাস কাগজ ডোবাও।	1. লাল লিটমাস কাগজ ও নীল লিটমাস কাগজের বর্ণের কী কোনো পরিবর্তন হলো ? ....। 2. নীল ও লাল লিটমাস কাগজের কি পরিবর্তন হলো ? ....।	1. .... 2. ....

বেশি চাপে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস জলে অনেক বেশি পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। তোমরা নিশ্চয় দেখেছ কোল্ডড্রিংকস্-এর বোতল খুললে বুদবুদ আকারে প্রচুর ফ্যানা বোতলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

এমন কেন হয় বলে তোমার মনে হয় ?

....।

কার্বন ডাইঅক্সাইডের দ্রাব্যতা: কার্বন ডাইঅক্সাইড জলে অল্প দ্রাব্য, চাপ বাড়লে দ্রাব্যতা বাড়ে। জলে কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রাব্য বলেই জলজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ করতে পারে, শামুক-ঝিনুকের খোলা তৈরি হওয়া সম্ভব হয়। তোমার দেহের রক্তে কার্বন ডাইঅক্সাইড যদি দ্রবীভূত না হতো তাহলে দেহের নানান অঙ্গ থেকে ফুসফুসে CO_2 পৌঁছোতে পারত কী?

কার্বন ডাইঅক্সাইডের রাসায়নিক ধর্ম:

1. দাহ্যতা:

হাতেকলমে

কার্বন ডাইঅক্সাইড নিজে দাহ্য নয় বা অন্য কোনো বস্তুকে দহনে সাহায্য করে না তা তোমরা আগেই পরীক্ষা করে জেনেছ। এবার ছবির মতো করে একটি কার্বন ডাইঅক্সাইডপূর্ণ গ্যাসজারে একটি জ্বলন্ত ম্যাগনেশিয়ামের ফিতা প্রবেশ করাও।

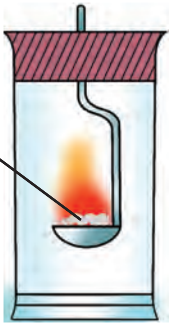

কী দেখবে	কেন এমন হলো
দেখা যাবে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যেও ম্যাগনেশিয়াম ফিতাটা উজ্জ্বল শিখায় জ্বলছে।	কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে জ্বলন্ত ম্যাগনেশিয়াম বিক্রিয়া করতে পারে। আর তার ফলে সাদা রঙের ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইডের গুঁড়ো এবং কালো কার্বন উৎপন্ন হবে। $2Mg + CO_2 = 2MgO + C$

জ্বলন্ত সোডিয়াম বা পটাশিয়ামের টুকরো কার্বন ডাইঅক্সাইডপূর্ণ গ্যাসজারে প্রবেশ করালে সোডিয়াম বা পটাশিয়াম জ্বলতে দেখা যাবে।

$$4Na + 3CO_2 = 2Na_2CO_3 + C \qquad 4K + 3CO_2 = 2K_2CO_3 + C$$

2. জলের সঙ্গে বিক্রিয়া: CO_2 গ্যাসকে জলে দ্রবীভূত করে লিটমাস পরীক্ষার সাহায্যে তোমরা জেনেছ যে CO_2 গ্যাসের অ্যাসিড ধর্ম বর্তমান।

জলের সঙ্গে CO_2-এর বিক্রিয়ায় কী হয় তা তোমরা নীচের বিক্রিয়ার সমীকরণ পূর্ণ করলেই বুঝতে পারবে।

$$H_2O + CO_2 = ______$$

এই বিক্রিয়ার জন্যই দূষণহীন, নির্মল পরিবেশের বৃষ্টির জলও সামান্য আম্লিক হয়।

3. ক্ষার বা ক্ষারকের সঙ্গে বিক্রিয়া:

Na_2O, $NaOH$, $Ca(OH)_2$, $Mg(OH)_2$ প্রভৃতিকে নিয়ে ভিজে লাল লিটমাস দ্বারা পরীক্ষা করলে দেখা যাবে লাল লিটমাস নীল হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং, এইসব ধাতব অক্সাইড ও হাইড্রক্সাইডগুলোর ক্ষারকীয় ধর্ম বর্তমান। CO_2 একটি আম্লিক অক্সাইড। ক্ষার বা ক্ষারকের সঙ্গে এর বিক্রিয়ায় কী হয় তা তোমরা পরীক্ষা করে জানতে পারবে। জেনে রাখো $CaCO_3$ জলে অদ্রাব্য কিন্তু $Ca(HCO_3)_2$ জলে দ্রাব্য।

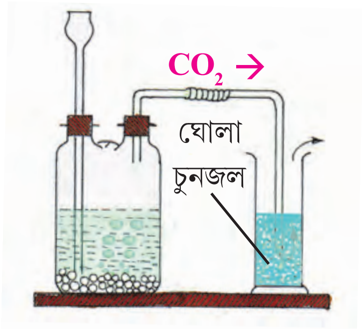

অল্প CO_2 গ্যাস চালনা করলে চুনজলের অবস্থা

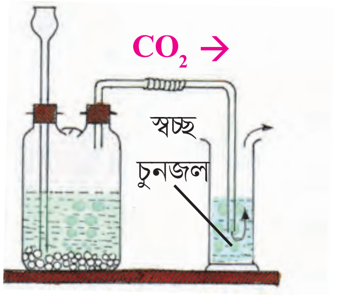

বেশি CO_2 গ্যাস চালনা করলে চুনজলের অবস্থা

কী করলে	কী দেখলে	কেন এমন হলো
1. ছবির মতো একটা কাচের পাত্রে কিছুটা পরিষ্কার চুনজল [$Ca(OH)_2$ দ্রবণ] নাও। এবার উলফ বোতল থেকে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসকে চুন জলের মধ্যে দিয়ে চালনা করো।	1. চুনজলের অবস্থা : ....।	1. বিক্রিয়ার সমীকরণ পূর্ণ করে ব্যাখ্যা করো। $Ca(OH)_2 + CO_2 =$ —— $+ H_2O$
2. ওই ঘোলা চুনজলের মধ্যে দিয়ে বেশি পরিমাণ CO_2 বেশিক্ষণ ধরে চালনা করো।	2. চুনজলের অবস্থা : ....।	2. অদ্রাব্য ক্যালশিয়াম কার্বনেট থেকে দ্রাব্য বাইকার্বনেট উৎপন্ন হয় $Ca(OH)_2 + CO_2 + H_2O = Ca(HCO_3)_2$

- বাড়িতে চুনকাম করার জন্য পোড়াচুনে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখা হয়। দু-তিনদিন পরে কলিচুন থিতিয়ে পড়ার পর স্বচ্ছ চুনজলের ওপরে সরের মতো আস্তরণ পড়তে দেখেছ কখনও ?

(i) এই আস্তরণটা হলো ক্যালশিয়াম কার্বনেটের ($CaCO_3$)। কী করে হলো?

....।

(ii) এই আস্তরণ খানিকটা যোগাড় করে টেস্টটিউবে নিয়ে লঘু HCl দিলে কী দেখবে? সমীকরণসহ লেখো।

....।

(iii) একটা টেস্টটিউবে খানিকটা স্বচ্ছ চুনজল নিয়ে তার মধ্যে একটা স্ট্র দিয়ে ফুঁ দিতে থাকো। দেখবে সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে দ্রবণ ঘোলা হয়ে যাচ্ছে। তোমার নিশ্বাসে যদি CO_2 থাকে তাহলে ওই সাদা অধঃক্ষেপ কীসের বলে তোমার মনে হয়? বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখো।

....।

ওপরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নীচের সমীকরণগুলোর শূন্যস্থান পূরণ করো ও ব্যাখ্যা করো:

রাসায়নিক বিক্রিয়া	ব্যাখ্যা
(i) $2NaOH + CO_2 =$ ________ $+ H_2O$ (ii) $Mg(OH)_2 + CO_2 =$ ________ + ______ (iii) $2KOH + CO_2 =$ ________ $+ H_2O$	

CO_2-এর জারণ ক্ষমতা:

লোহিততপ্ত কার্বন, জিঙ্কচূর্ণ বা ম্যাগনেশিয়ামচূর্ণের উপর দিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস চালনা করলে নীচের বিক্রিয়াগুলো ঘটে। বিক্রিয়ার সমীকরণ দেখে কোন পদার্থ জারিত হয়েছে ও কে বিজারিত হয়েছে ব্যাখ্যা করো:

রাসায়নিক বিক্রিয়া	কে জারিত ও কে বিজারিত হয়েছে ব্যাখ্যা দাও
(i) $C + CO_2 = 2CO$ (ii) $2Mg + CO_2 = 2MgO + C$ (iii) $Zn + CO_2 = ZnO + CO$	

গ্রিনহাউস এফেক্ট

তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ রোদ্দুরে দাঁড়ালে গরম লাগে, ভিজে গামছা রোদ্দুরে রাখলে শুকিয়ে যায়। গরমকালে দুপুরবেলা টিনের চাল কেমন তেতে ওঠে তোমরা জানো। এত তাপ আসে কোত্থেকে? সূর্যের আলোয় ইনফ্রারেড বলে একরকমের অদৃশ্য রশ্মিও থাকে। প্রধানত ইনফ্রারেড রশ্মিই তাপের অনুভূতি সৃষ্টি করে। সোজা কথায় একে আমরা বলতে পারি তাপতরঙ্গ।

মে মাসের রোদ্দুরে রাস্তায় দাঁড়ানো জানালা-দরজা বন্ধ করা গাড়ির মধ্যে রাস্তার চেয়ে বেশি গরম বোধ হয়। গরমকালের দুপুরে কাচের জানালা বন্ধ থাকলে ঘরের মধ্যেও অসহ্য গরম বোধ হয়। এর কোনোটা কী কখনও লক্ষ করেছ? কেন এমন হয়?

কাচের মধ্যে দিয়ে সূর্যালোকের ইনফ্রারেড রশ্মি গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে ও নানান জিনিসকে গরম করে তোলে। তোমরা জানো যে তাপকে পুরোপুরি ধরে রাখা যায় না। গাড়ির মধ্যে জিনিসগুলোও একসময় ইনফ্রারেড রশ্মি ছেড়ে দিতে থাকে। এখন দরকারি কথাটা হলো এই যে সূর্যের আলোর সঙ্গে যে ইনফ্রারেড এসেছিল তার শক্তি ছিল বেশি, আর গরম জিনিসগুলোর ছেড়ে দেওয়া ইনফ্রারেডের শক্তি কিছুটা কম। এই ছেড়ে দেওয়া ইনফ্রারেড রশ্মি যদি কাচের মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারত তাহলে কিন্তু গাড়ির ভেতরটা অতটা গরম হয়ে উঠত না। কাচের মধ্যে দিয়ে কম শক্তির ইনফ্রারেড রশ্মি বেরোতে পারে না বলেই গাড়ির ভেতর বা কাচের জানালা লাগানো ঘরও তেতে ওঠে।

সূর্য থেকে যে ইনফ্রারেড রশ্মি পৃথিবীতে এসে পড়ে বাতাসের নানান গ্যাসের অণুরা তাকে শুষে নিতে পারে না। পৃথিবী এই ইনফ্রারেড রশ্মির শক্তি শুষে নিয়ে গরম হয়ে ওঠে। শুষে নেওয়া তাপশক্তির কিছুটা মাটি-জল-পরিবেশের নানান পদার্থের অণুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বাকি শক্তিটুকু পৃথিবী আবার

ইনফ্রারেড রশ্মি হিসেবে ছেড়ে দেয়। বাতাসে থাকা কিছু কিছু গ্যাসের অণুরা এই ছেড়ে-দেওয়া, কম শক্তির ইনফ্রারেড রশ্মিকে শুষে নেয়। এইসব গ্যাস হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), জলীয় বাষ্প (H_2O), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), মিথেন (CH_4), ওজোন (O_3) এবং ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন যৌগগুলো। এই গ্যাস অণুদের ইনফ্রারেড শোষণ ও পুনর্বিকিরণের ফলে বায়ুমণ্ডলে কিছুটা তাপ আটকে পড়ে, সবটুকু মহাকাশে ফিরে যেতে পারে না। একেই বলে 'গ্রিনহাউস এফেক্ট' (Greenhouse Effect)। অক্সিজেন (O_2) বা নাইট্রোজেন (N_2) কিন্তু গ্রিনহাউস গ্যাস নয়। এরা ইনফ্রারেড রশ্মিকে শুষে নিতে পারে না।

বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাস আসে কোথা থেকে

তেল-কয়লা-প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো জ্বালানি পোড়ানো, সিমেন্ট তৈরির কারখানায় চুনাপাথর গরম করা— এসব থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বাতাসে মেশে।

মাটিতে যেসব ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া থাকে তারা নাইট্রেটকে ধাপে ধাপে বিজারিত করার সময় নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) ও নাইট্রোজেন (N_2) তৈরি হয়ে বাতাসে মেশে।

মিথেন আসে কোথা থেকে? পৃথিবীর বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত-জলাভূমি-বর্ষাঅরণ্যের মেথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়া মিথেন তৈরি করে চলেছে। গবাদিপশুদের পাকস্থলীর রুমেন প্রকোষ্ঠ ও উইপোকাদের অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়াও মিথেন তৈরি করে বাতাসে ছেড়ে দিচ্ছে।

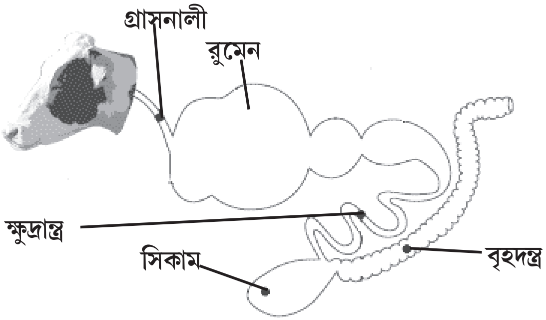

গোরুর খাদ্যনালীর চিহ্নিত চিত্র

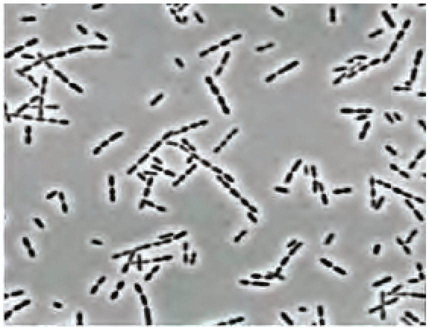

মেথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়া

তবে আমাদের আসল চিন্তার কারণ মানুষের কর্মকাণ্ডে তৈরি কার্বন ডাইঅক্সাইড যার পরিমাণ গত তিনশো বছরে ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন যে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়তে থাকলে একসময় গ্রিনহাউস এফেক্টের জন্য বাতাসের উষ্ণতা বেড়ে যাবে। তখন উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর বরফের স্তর গলে গিয়ে সমুদ্রের ধারের বহু শহরকে ডুবিয়ে দেবে। গ্রিনহাউস এফেক্টের ফলে বাতাসের উষ্ণতা বৃদ্ধির এই সম্ভাবনাকে বলা হচ্ছে বিশ্বউষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং (Global Warming)। উষ্ণায়নের ফলে ভবিষ্যতে পৃথিবীর বহু অংশে খরা দেখা দিতে পারে, কৃষিজ উৎপাদন কমে যেতে পারে, জীববৈচিত্র্য হ্রাস পেতে পারে। উষ্ণতা বৃদ্ধি মশার বংশবৃদ্ধির সহায়ক হয়ে উঠলে মশাবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে পারে।

কার্বনঘটিত পলিমার ও তার ব্যবহার

আমাদের চারপাশের বিভিন্ন দিকে লক্ষ করলেই আমরা নানারকম ক্ষেত্রে প্লাস্টিক বা পলিথিনের ব্যবহার দেখতে পাই। একটু ভালো করে দেখলেই দেখতে পাবে প্লাস্টিক, পলিথিন, থার্মোকল, নাইলন — এইসব পদার্থের তৈরি নানা অব্যবহৃত জিনিস বা তার অংশবিশেষ বর্জ্য হিসাবে চারদিকে ছড়িয়ে আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ধরনের পদার্থ থেকে তৈরি জিনিস ব্যবহার হয়। তোমাদের বাড়ির বা স্কুলের চারপাশে পড়ে -থাকা বর্জ্য থেকে তা জানার চেষ্টা করো। প্রয়োজনে বাড়ির বড়োদের বা শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও। তারপর নীচের সারণিতে লেখো।

কোন পদার্থ থেকে তৈরি জিনিস	কোথায় ব্যবহার হয়
পলিথিন	ক্যারিব্যাগ, খাবারের প্যাকেট
প্লাস্টিক	মগ, বালতি ইত্যাদি তৈরিতে
থার্মোকল	
নাইলন	

ওপরের পদার্থগুলো লক্ষ করলে দেখবে তাদের মধ্যে কয়েকটা ধর্ম দেখা যায়—

(i) কিছু পদার্থ নরম, ইচ্ছামতো বাঁকানো যায়।

(ii) অন্য কিছু পদার্থ হয়তো জিনিসপত্র তৈরির সময় নরম ছিল, কিন্তু একবার শক্ত হয়ে গেলে আর তাদের আকৃতি পালটানো যায় না।

কার্বনঘটিত পলিমার ও তার ব্যবহার :

প্লাস্টিক ও পলিমারকে বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর মানবসভ্যতার একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলা যেতে পারে। এখনকার দিনে এমন কোনো দিক নেই যেখানে প্লাস্টিক ও পলিমারের ব্যবহার নেই। নীচের ছবিতে ক্ষেত্রগুলো লক্ষ করো যেখানে পলিমারের বা প্লাস্টিকের ব্যবহার ঘটছে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে পলিমার হলো একটা যৌগিক পদার্থ। একইরকম বা বিভিন্নরকম বহুসংখ্যক অণু রাসায়নিকভাবে জুড়ে গিয়ে এরকম শৃঙ্খলাকৃতি দীর্ঘ যৌগ তৈরি করে। নমনীয়তা বা প্লাস্টিকত্ব (plasticity) হলো এইজাতীয় যৌগের একটা বিশেষ গুণ। কিন্তু অনেক সময়েই আমরা মানুষের সৃষ্টি করা অনেকরকম পলিমারকেই প্লাস্টিক বলে থাকি। অর্থাৎ বহুক্ষেত্রেই প্লাস্টিক ও পলিমার কথাদুটো সমার্থক হয়ে গেছে। যদিও একরকম বিশেষ ধরনের পলিমারকেই প্লাস্টিক বলা হয়। তাই আমাদের চারদিকে নিত্য ব্যবহৃত পলিমার সম্বন্ধে আরো একটু জানা প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য যে অধিকাংশ কৃত্রিম পলিমারই বিভিন্ন কার্বনঘটিত যৌগ থেকে তৈরি করা। এখন প্রশ্ন হলো এতরকম পলিমার ব্যবহার শুরু হলো কেন? আগে যে সমস্ত কাজে অন্য জিনিস ব্যবহার হতো, তার পরিবর্তে বিভিন্ন পলিমার ব্যবহারের দুটো প্রধান কারণ হলো —

(i) কৃত্রিমভাবে তৈরি পলিমারের আয়ু বেশি, (ii) বিভিন্ন পলিমারের জিনিস তৈরির সময় তাকে ইচ্ছামতো আকৃতি দেওয়া যায়।

আমাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে যে সমস্ত পলিমার ব্যবহার হয়ে থাকে, এসো তাদের ধর্ম ও সেই ধর্মকে কীভাবে কাজে লাগানো হয়েছে তা একটা সারণির মাধ্যমে দেখা যাক। এদের কোনো ব্যবহার জানা থাকলে তা নীচে লেখো।

পলিমারের নাম	তার ধর্ম	ব্যবহার
(i) পলিথিন	নমনীয় কিন্তু আংশিক কঠিন (মোমের মতো), তড়িতের কুপরিবাহী, কিছু কিছু রাসায়নিকের প্রতি নিষ্ক্রিয়।	
(ii) টেফলন	উচ্চ গলনাঙ্কবিশিষ্ট, তড়িতের কুপরিবাহী, বিভিন্ন ক্ষয়কারী রাসায়নিকের প্রতি উল্লেখযোগ্যভাবে নিষ্ক্রিয়।	নন-স্টিক বাসনপত্র তৈরিতে, গাড়ির রঙের ওপর প্রলেপ দিতে, রাসায়নিক শিল্পে।
(iii) পিভিসি	স্বচ্ছ বা অস্বচ্ছ, শক্ত; জল, তেল পেট্রোল ও কিছু কিছু রাসায়নিকের সংস্পর্শে নিষ্ক্রিয়।	জলের পাইপ, ইলেকট্রিক তারের আবরণ, বিভিন্ন জিনিসের পাত্র তৈরিতে, বর্ষাতি, গামবুট, চপ্পল তৈরিতে।
(iv) নাইলন	স্বচ্ছ, শক্ত, জলরোধী তন্তু।	
(v) টেরিলিন	নাইলনের মতোই জলশোষণ করে না, সহজে দাগ ধরে না, শক্ত, ভাঁজরোধী, দীর্ঘস্থায়ী তন্তু।	সুতির সুতো মিশিয়ে টেরিকট নামের কাপড় তৈরি করা হয়। এটা টেরিলিনের মতো ভাঁজরোধী কিন্তু সুতির সুতো থাকায় জল শোষণ করতে পারে, এবং বায়ু চলাচল করতে পারে। তাই আমাদের মতো আর্দ্র-গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জামাকাপড় তৈরিতে ব্যবহার ব্যাপক।

কৃত্রিম পলিমার ব্যবহারের সংকট

এখন যে এতরকম কৃত্রিম পলিমার ব্যবহার করা হচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো এদের দীর্ঘায়ু। কিন্তু কেন এরকম দীর্ঘায়ু এধরনের কৃত্রিম পলিমারের?

পলিমার তৈরির সময় অনেকগুলো অণু জুড়ে যায় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, অর্থাৎ বন্ধন তৈরির মাধ্যমে। যদি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় এই বন্ধনগুলো ভাঙা সম্ভব হয় তবে পলিমারের আয়ু কম হবে।

বলতে পারো সুতির কাপড় কী দিয়ে তৈরি হয়?

তুলো থেকে তৈরি করা সুতো দিয়ে। কিন্তু একটা সিন্থেটিকের বা টেরিলিনের কাপড় তৈরি হয় কৃত্রিম উপায়ে তৈরি পলিমারের সুতো থেকে। তাহলে একটা সুতির কাপড়ের টুকরো আর একটা সিন্থেটিক কাপড়ের টুকরো যদি একই সময় ধরে মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকে, তবে বেশ কিছুদিন পরে কী দেখা যাবে?

কোন জিনিসের কাপড়ে	কী ঘটতে দেখবে
সুতির কাপড়	
সিন্থেটিক কাপড়	

তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ তুলো বা খড় জঞ্জালের গাদায় বা পুকুরপাড়ে পড়ে থাকতে থাকতে নষ্ট হয়ে যায়। আমরা চলতি কথায় বলি ‘খড়টা পচে গেছে’। তুলো বা খড় কী দিয়ে তৈরি ? তুলো বা খড়ের প্রধান উপাদান হলো সেলুলোজ।

সেলুলোজ হলো একটা কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় মস্ত বড়ো অণু (পলিমার)। প্রাকৃতিক পরিবেশে অনেক ব্যাকটেরিয়া আর ছত্রাক থাকে। এরা সেলুলোজকে নিজেদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। প্রকৃতিতে থাকা এইসব ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক নানান এনজাইম দিয়ে সেলুলোজ কিংবা সবজি বা ফলের খোসার অন্যান্য কার্বোহাইড্রেট পলিমারকে ভেঙে ফেলতে পারে। মাছমাংসের টুকরোয় নানান প্রোটিন থাকে। প্রোটিনও পলিমার। বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন ভাঙার এনজাইম আছে, তাই প্রকৃতিতে মাছমাংসের টুকরোও পড়ে থাকে না, নষ্ট হয়ে যায়। পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির পর কোটি কোটি বছরের বিবর্তনে এইসব এনজাইম সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবে জীবের দ্বারা নষ্ট হয়ে যাওয়াকে বলে ‘বায়োডিগ্রেডেশন’ (Biodegradation)। প্রাকৃতিক জৈব পলিমারদের তাই বায়োডিগ্রেডেবল (Biodegradable) বলা যায়।

কিন্তু পলিথিন কিংবা পিভিসি (PVC)-র মতো পলিমার বায়োডিগ্রেডেবল নয়। এগুলো হলো মানুষের তৈরি (কৃত্রিম) পলিমার যা কোনোদিনই প্রকৃতিতে ছিল না। কোনো ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের এইসব কৃত্রিম পলিমারের অণু ভেঙে ফেলার এনজাইম নেই। ফেলে দেওয়া পলিথিনের ব্যাগ বা PVC পাইপের টুকরো, কী ডটপেনের রিফিল তাই সেলুলোজের মতো নষ্ট হয় না, পরিবেশে পড়েই থাকে। এইসব পলিমারকে তাই বলা হয় নন-বায়োডিগ্রেডেবল (Non-biodegradable) অর্থাৎ জীবাণুরা যা ভেঙে ফেলতে পারবে না।

বিশেষ কিছু ব্যাকটেরিয়া কয়েকধরনের পলিমার তৈরি করতে পারে যা বায়োডিগ্রেডেবল। এই পলিমার দিয়ে বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক তৈরি করা হচ্ছে। এগুলো পরিবেশে ফেলে দিলে নানান জীবাণু এদের ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেয়।

5 প্রাকৃতিক ঘটনা ও তার বিশ্লেষণ

বজ্রপাত

উত্তর আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ। এতক্ষণ ধরে বইতে থাকা হাওয়া থেমে গেছে। কেমন একটা থমথমে ভাব। হঠাৎ নীলচে কালো মেঘের বুকে আঁকাবাঁকা রেখার এক তীব্র আলোর ঝলকানি। তারপর জোরালো আর গম্ভীর এক শব্দ। কালবৈশাখী ঝড়ে বজ্রপাতের এই দৃশ্য দেখেনি এমন কেউ তোমাদের মধ্যে নেই বোধহয়। বছরের অন্য সময়েও বজ্রপাত হতে নিশ্চয় দেখেছ। আমাদের এখানে শীতকালে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টি প্রায় হয়ই না। বর্ষাকালের মেঘ থেকেও বজ্রপাত কমই ঘটে থাকে।

প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ হিসাবে বিভিন্ন দেবতা বা অশুভ শক্তিকে দায়ী করা হতো। আমরা কিন্তু এখানে বজ্রপাতের বিজ্ঞানসম্মত কারণ বোঝার চেষ্টা করব। এটা করতে গিয়ে আমাদের কিছু বৈজ্ঞানিক ধারণা (Concept) সম্পর্কে জানতে হবে।

ছোটো ছোটো ফুলকি

তুমি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ, শীতকালে উলের জামাকাপড় খোলার সময় গায়ের লোমগুলো কেমন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। একটা খুব ক্ষীণ চিড় চিড় শব্দ হয়। এবারে তুমি একটা ছোটো পরীক্ষা করো।

শীতের রাতে খাটে নাইলনের মশারি টাঙানো আছে। জানালা-দরজা বন্ধ করে ঘরের আলো নিভিয়ে দাও। দরকার হলে জানালায় পর্দা বা কাপড় ঝুলিয়ে দাও যাতে ঘর যথেষ্ট অন্ধকার হয়। তোমার গায়ের উলের

চাদর বা সোয়েটার খুলে নাও। এবারে ছবির মতো করে মশারিতে জামা বা সোয়েটারটি বেশ তাড়াতাড়ি করে বোলাও।

কিছু কি দেখতে পাচ্ছ? কিছু শুনতে পাচ্ছ কি? হ্যাঁ, ঠিকই দেখছ — মশারির গায়ে ছোটো ছোটো আগুনের ফুলকি । একটা ক্ষীণ চিড়চিড় শব্দও নিশ্চয় শুনতে পাচ্ছ।

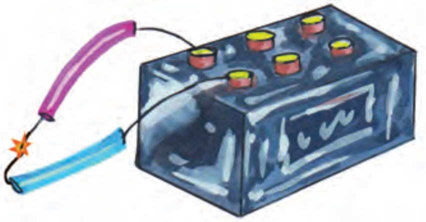

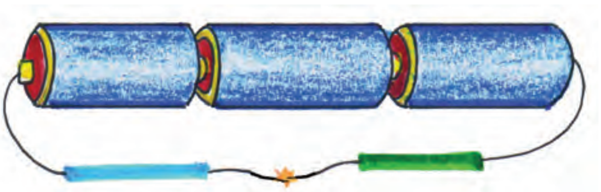

টর্চে বা রেডিয়োতে ব্যবহৃত তড়িৎকোশ তোমরা সবাই দেখেছ । একে ড্রাইসেল বলে । লাউডস্পিকার (মাইক) চালাতে যে ব্যাটারি ব্যবহার করা হয় তাও তোমরা দেখেছ নিশ্চয় । এবার ব্যাটারির দু-প্রান্তে দুটো তড়িৎবাহী তার লাগাও। তারদুটোর আস্তরণ ছাড়ানো খোলা অংশ দুটো স্পর্শ করিয়েই দ্রুত ছাড়িয়ে নাও । এভাবে কয়েকবার করে দেখো কী ঘটছে। দু-তিনটে ড্রাইসেল পরপর বসিয়েও পরীক্ষাটি করতে পারো।

তারদুটো পরস্পরের থেকে যখনই ছাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে ঠিক তখনই তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ তৈরি হয়। হয়তো ভাবছ এরকম স্ফুলিঙ্গ তুমি কাঁচি শান দেওয়ার সময়ও দেখেছ। খুব জোরে ঘুরছে এরকম একটা পাথরের চাকতির গায়ে কাঁচিটা ধরা হয় আর প্রচুর ফুলকি ছিটকে বেরোয়। পাথর ও ধাতুর প্রবল ঘর্ষণে তাপ তৈরি হয়। ওই তাপে উত্তপ্ত ছোটো ছোটো ধাতুর টুকরোগুলো ফুলকির আকারে ছিটকে বেরোয়। এগুলো কিন্তু তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ নয়।

কোনো সুইচ চাপতে গিয়ে ছোটো তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ দেখে থাকতে পারো। বৈদ্যুতিক পোস্টে যেখানে দুটো তার জোড়া আছে সেখানেও তড়িৎ ফুলকি দেখেছ হয়তো। জোরে হাওয়া বইছে যখন তখনই এই ফুলকি দেখার সম্ভাবনা বেশি। রাতে বিদ্যুৎচালিত রেলগাড়িতে চড়েছ অনেকে । হয়তো খেয়াল করেছ মাঝেমাঝেই তীব্র আলো পড়ছে পাশের অন্ধকার মাঠে। রেলগাড়ির যে অংশটা বৈদ্যুতিক তার ছুঁয়েছে তাকে পেন্টোগ্রাফ বলে। চলার সময় গাড়িতে ঝাঁকুনি হলে পেন্টোগ্রাফ যেই উপরের তার থেকে একটু ছাড়িয়ে যায় তখনই এই জোরালো আলো দেখা যায়। এই সবগুলোই তড়িতের ফুলকি। বজ্রও এরকম তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ কিন্তু তা খুবই বড়ো ধরনের।

অতি জোরালো বজ্র এবং তোমার জামাকাপড়ে তৈরি হওয়া ছোটো তড়িৎ ফুলকি আসলে একই বিষয় — এই কথাটি 1752 সালে স্পষ্ট করে প্রমাণ করেন বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন।

তড়িৎ আধান এবং আয়ন

পরমাণুর উপাদান কণাগুলোর মধ্যে ইলেকট্রন আর প্রোটন তড়িৎ আধান বা চার্জযুক্ত কণা। কণাদুটিতে ভিন্নধর্মী চার্জ (Electric Charge) সমান পরিমাণে আছে। ইলেকট্রন কণার চার্জকে আমরা বলি ঋণাত্মক আধান বা নেগেটিভ চার্জ (Negative Charge)। '—' চিহ্ন দিয়ে এই চার্জ বোঝানো হয়। প্রোটনের চার্জকে বলা হয় ধনাত্মক আধান (Positive Charge) ।এই ধরনের চার্জকে বোঝানো হয় '+' চিহ্ন দিয়ে।

পরমাণু সাধারণভাবে তড়িৎবিহীন। কারণ পরমাণুতে প্রোটন ও ইলেকট্রন কণার সংখ্যা সমান থাকে। যদি কোনো কারণে পরমাণুতে প্রোটনের সংখ্যা এবং ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান না থাকে তাহলে সেরকম পরমাণুকে আমরা আয়ন বলি। প্রোটনের সংখ্যা ইলেকট্রনের সংখ্যার চেয়ে বেশি হলে সেটি ধনাত্মক আয়ন (Positive Ion) । প্রোটনের সংখ্যা ইলেকট্রনের সংখ্যার চেয়ে কম হলে পরমাণুটি হয়ে ওঠে ঋণাত্মক আয়ন (Negative Ion) ।

কোনো পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলে পড়ে থাকা অংশটুকু ধনাত্মক আয়ন গঠন করে । বেরিয়ে যাওয়া ইলেকট্রন অন্য কোনো পরমাণু বা একাধিক পরমাণুর জোটের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে । তখন এই দ্বিতীয় পরমাণু বা পরমাণুর জোট হয়ে ওঠে ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত। পরমাণু থেকে বেরিয়ে পড়া ইলেকট্রন অথবা কোনো আয়ন অনেক সময় বায়ুতে ভাসমান খুব সূক্ষ্ম ধুলিকণা বা জলকণার গায়ে আশ্রয় নিতে পারে। সেই কণাটিও তখন তড়িৎগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সূক্ষ্ম কণা হলেও এরা কিন্তু পরমাণু বা অণুর তুলনায় অনেকগুণ বড়ো। তড়িৎযুক্ত বা তড়িৎগ্রস্ত এইসব আয়ন, পরমাণুর জোট, সূক্ষ্ম ধুলিকণা বা জলকণা বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে রয়েছে।

তড়িদাহিত হওয়া, তড়িৎ ক্ষরণ হওয়া,তড়িৎ আবেশ

শীতকালে প্লাস্টিকের চিরুনি দিয়ে শুকনো চুল আঁচড়ালে চিরুনিতে ঋণাত্মক তড়িৎ আধান জমে। আমরা বলে থাকি চিরুনি ঋণাত্মক তড়িৎ দ্বারা আহিত (Charged) হয়েছে। এবারে চিরুনিটাকে ছোটো ছোটো কাগজের টুকরোর কাছে ধরলে কাগজের টুকরো আকৃষ্ট হয়। আহিত চিরুনির প্রভাবে কাগজের টুকরোর যে দিকটা চিরুনির কাছে আছে সেখানে ধনাত্মক আধান জমে। একে আমরা **তড়িৎ আবেশ** বলি। বিপরীত আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কাগজের টুকরো এজন্যে চিরুনির দিকে ছুটে আসে।

চুল আঁচড়ে চিরুনিটাকে বেশ কিছুক্ষণ টেবিলে রেখে দাও। এবারে দেখোতো কাগজের টুকরো আকর্ষণ করছে কিনা। হয়তো তখনও সামান্য আকর্ষণ করছে। সময়টা যথেষ্ট বেশি হলে দেখতে পাবে চিরুনিটার আকর্ষণ ধর্ম একেবারেই নেই। চিরুনিটার আধান হয় বাইরে বেরিয়ে গেছে বা বাইরে থেকে বিপরীত আধান চিরুনিতে এসেছে। এই ঘটনাকে আমরা বলি চিরুনির আধান **ক্ষরণ** হয়ে গেছে (Discharged)।

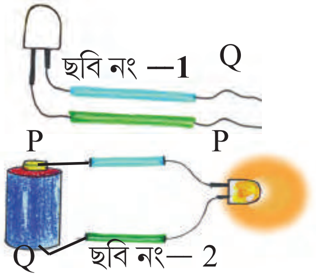

তড়িৎ প্রবাহ, বিভব পার্থক্য

1 নং ছবিতে যেমন দেখছ তেমনভাবে দুটো তার একটা LED বালবে বা একটা টর্চের বালবে জুড়ে দাও। এবারে তারদুটোর খোলা প্রান্ত (P ও Q) একটা ড্রাইসেলের দু-প্রান্তে চেপে ধরো (2 নং ছবি)।

বালবটি জ্বলে উঠল তো? কেন?

কারণ বালবের মধ্য দিয়ে **তড়িৎ প্রবাহ** হচ্ছে। এর মানে হলো পরিবাহী তারের

মধ্য দিয়ে আধানের চলাচল ঘটছে। এ থেকে ভেবে নিও না তড়িৎপ্রবাহ ঘটতে গেলে পরিবাহী তার লাগবেই। বায়ুর মধ্য দিয়ে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক তড়িৎকণার চলাচল ঘটলেও আমরা তাকে তড়িৎপ্রবাহ বলব।

কোশের দু-প্রান্ত পরিবাহী তার দিয়ে জুড়লে তড়িৎপ্রবাহ ঘটে কেন? ড্রাইসেলটি ভালো করে দেখো। কোশটির গায়ে কোথাও 1.5 V লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছ কি? 1.5 V লিখে আমাদের জানানো হচ্ছে — কোশের দু-প্রান্তের মধ্যে দেড় ভোল্ট (1.5 V) **বিভব পার্থক্য** আছে। কোশটির দু-প্রান্ত জুড়ে দিলে তড়িৎ প্রবাহ হয় — কোশটির দু-প্রান্তের বিভব পার্থক্যই এই প্রবাহ ঘটার কারণ।

প্রকৃতিতে ঘটে চলা বিষয়গুলো সাধারণত খুবই জটিল ও রহস্যময়। সেবিষয়ে কিছু বলার আগে আমরা আর দু-একটা পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করব। এর ফলে প্রকৃতির ঘটনাগুলো বুঝতে আমাদের কিছুটা সুবিধা হবে।

3 (A) ছবিটা দেখো।

দুটো ধাতুর পাত (A ও B), একটা অপরিবাহী স্ট্যান্ড (S) দিয়ে দাঁড় করানো আছে। পাতদুটো পরস্পরের থেকে কিছুটা দূরে রাখা হয়েছে। একটা ড্রাইসেলের দু-প্রান্তের সঙ্গে পরিবাহী তার দিয়ে পাতদুটো যুক্ত। দু প্রান্তে পরিবাহী তার লাগানো আছে এমন একটা বালব (L) পাতদুটোতে জুড়ে দিলে কী হবে? বালবটি জ্বলে উঠবে। কেন?

কারণ বালবের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ হবে।

তড়িৎপ্রবাহ কেন হবে ? তাহলে কী পাতদুটোর মধ্যে বিভব পার্থক্য আছে?

নিশ্চয় আছে। কারণ পাতদুটো ড্রাইসেলের দু-প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত।

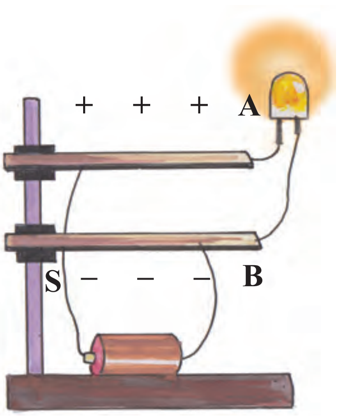

3 A

3 (B) ছবিটা দেখো।

যদি বালবটি জোড়া না থাকে তাহলে কি একটুও তড়িৎ প্রবাহ হবে না?

খুব সামান্য তড়িৎপ্রবাহ কিন্তু তখনও হবে। পাতদুটোর মাঝের বায়ুতে থাকা ধনাত্মক আয়ন B পাতের দিকে আর ঋণাত্মক আয়ন A পাতের দিকে আকৃষ্ট হবে। আয়নের এই চলাচলও কিন্তু তড়িৎপ্রবাহ। এই প্রবাহের পরিমাণ খুবই সামান্য, মাপতে খুব সূক্ষ্ম যন্ত্র লাগবে।

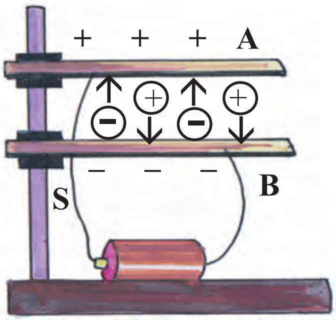

3 B

⊕ ধনাত্মক আয়ন
⊖ ঋনাত্মক আয়ন

ছবিতে একটা বিষয় এতক্ষণে নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ। A পাতের গায়ে (+) এবং B পাতের গায়ে (–) চিহ্ন দেওয়া আছে। তাহলে কি ড্রাইসেলের সঙ্গে যুক্ত হলেই পাতদুটো আহিত (Charged) হয়? হ্যাঁ, সে জন্যেই (+) এবং (–) চিহ্ন দেখানো হয়েছে পাতদুটোতে। খেয়াল করে দেখো A পাতের সঙ্গে ড্রাইসেলের ধনাত্মক প্রান্ত আর B পাতের সঙ্গে ঋণাত্মক প্রান্ত যুক্ত আছে।

পাত দুটো থেকে ড্রাইসেলটি খুলে নেওয়া হলে কি পাতদুটোর মাঝের বিভব পার্থক্য থাকবে? কিছুক্ষণ থাকবে। মাঝের বায়ুর আয়নগুলোর তড়িৎ প্রবাহের জন্যেই বেশ কিছুক্ষণ পর পাত দুটো একেবারেই আধানহীন হবে (Discharged)। তুমি চাইলে ড্রাইসেলটি জুড়ে দিয়ে পাত দুটোকে আবার আহিত (Recharged) করতে পারো।

3 (C) ছবিটা দেখো।

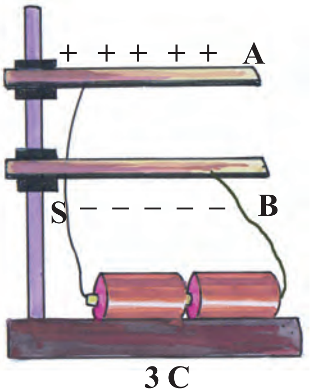

3 C

দুটো ড্রাইসেল পরপর বসিয়ে ধাতুর পাতদুটো জোড়া হয়েছে, বলোতো এবারে পাতদুটোর মধ্যে বিভব পার্থক্য কত? হয়তো বুঝতে পারছ এবারে বিভব পার্থক্য 3 ভোল্ট (1.5 V + 1.5 V = 3 V)।

প্রকৃতির নিজস্ব তড়িৎপ্রবাহ এবং বিভব পার্থক্য

মেঘহীন পরিচ্ছন্ন দিন। এমন এক ঝলমলে সকালে তুমি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়েছ। মাথার উপরে উজ্জ্বল নীল আকাশ। তুমি খেয়ালই করছ না তোমার আশেপাশে বাতাসে সারাক্ষণই তড়িৎপ্রবাহ চলছে। কেন কেউ বুঝতে পারছে না? তোমার চারপাশে উপর থেকে নীচের দিকে বয়ে চলা এই তড়িৎস্রোত খুবই সামান্য, মাপতে হলে সূক্ষ্ম যন্ত্র চাই। ভেবে দেখো সারা পৃথিবী জুড়েই বাতাসে তড়িতের এই স্রোত বয়ে চলেছে। ভূপৃষ্ঠের সমগ্র ক্ষেত্রফল জুড়ে এই তড়িৎপ্রবাহের মোট পরিমাণ কিন্তু যথেষ্ট বেশি। একটা 100 ওয়াটের বালব বাড়িতে জ্বালিয়ে রাখলে তার মধ্যে দিয়ে যতটা তড়িৎপ্রবাহ যায় তার থেকে এই প্রাকৃতিক তড়িৎ প্রবাহের মোট পরিমাণ প্রায় চার হাজার গুণ বেশি।

এই তড়িৎপ্রবাহ হচ্ছে কেন? তবে কি ভূপৃষ্ঠ আর উপরের আকাশের মধ্যে কোনো বিভব পার্থক্য আছে? একটু আগের পরীক্ষাগুলোর ধাতুর পাতদুটোর কথা নিশ্চয় তোমার মনে পড়ছে। মোটামুটিভাবে পঞ্চাশ কিলোমিটার উপরের আকাশ আর ভূপৃষ্ঠের মধ্যে প্রায় চার লক্ষ ভোল্ট (400000 V) বিভব পার্থক্য আছে। প্রায় দু-লক্ষ সত্তর হাজার ড্রাইসেল পরপর সাজালে তার দু-প্রান্তের মধ্যে এই পরিমাণ বিভব পার্থক্য হয়।

উপরের আকাশ ও ভূপৃষ্ঠের মধ্যে বিভব পার্থক্য থাকার জন্যে এই তড়িৎপ্রবাহ হয়। তাতে কোনো না কোনো আহিত কণার (Charged Particles) চলাচল ঘটে? বায়ুতে থাকা বিভিন্নরকম আয়ন, আধানযুক্ত সূক্ষ্ম কণা—এদের কথা মনে আছে নিশ্চয়। এদের চলাচলই এই তড়িৎ প্রবাহ ঘটায়।

তাহলে প্রাকৃতিক বিভব পার্থক্য তো কমে যাবে, একসময় একেবারেই থাকবে না (আহিত ধাতুর পাতদুটোর কথা মনে রাখো)। হ্যাঁ সত্যিই সারাক্ষণের এই তড়িৎপ্রবাহের জন্যে প্রাকৃতিক বিভব পার্থক্য কমে যায় অনেকটা। তাহলে তো ধাতুর পাতদুটোর মতো ড্রাইসেল জুড়ে আবার তাদের আহিত করতে হয় (Recharging)।

বজ্রপাতই প্রকৃতির সেই ব্যবস্থা যা ঊর্ধ্বাকাশ এবং ভূপৃষ্ঠের মধ্যের বিভব পার্থক্য বজায় রাখে। বজ্রপাতের ফলে ভূপৃষ্ঠ ঋণাত্মক তড়িতে আহিত হয় আর উপরের আকাশ আহিত হয় ধনাত্মক আধানে।

তোমার মনে হতে পারে এত বজ্রপাত কখন হয়, অনেকদিন তো বজ্রপাত হয়ই না। আমরা কিন্তু সারা পৃথিবীর কথা ভাবছি। বজ্রপাত ঘটাতে পারে এমন ঝড়বৃষ্টির মেঘ সারা পৃথিবীর কোথাও না কোথাও হয়েই চলেছে। পৃথিবী জুড়ে রোজ প্রায় চল্লিশ হাজার (40000) ঝড়বৃষ্টি হয় যা থেকে প্রচুর বজ্রপাত হয়।

> একটা ভুল ধারণা চালু আছে যে, মেঘে মেঘে ঘর্ষণে বা মেঘের জলকণাগুলোর ঘর্ষণে মেঘ আহিত (Charged) হয়। ঘর্ষণের ফলে স্থিরতড়িৎ উৎপন্ন হয়, এই সঠিক তথ্যই এই ভুল ধারণার জন্য দায়ী বোধহয়। খেয়াল রাখতে হবে ঘর্ষণে স্থির তড়িৎ তৈরি হয় ঠিকই, কিন্তু তা সবসময়ই দুটি ভিন্ন পদার্থের তৈরি বস্তুর ঘর্ষণে।

বজ্রবিদ্যুতে ভরা ঝড়ের মেঘ

এই ধরনের মেঘ থেকেই সাধারণত বজ্রপাতসহ ঝড়বৃষ্টি হয়। অনেকটা অঞ্চল জুড়ে জলীয় বাষ্পভরা বায়ু উপরের দিকে উঠতে থাকে। আশপাশ থেকেও বায়ু ওই অঞ্চলের দিকে আসে এবং উপরে উঠতে থাকে। উপরে বায়ুর উষ্ণতা ও চাপ কম। জলীয় বাষ্পভরা বায়ু উপরে উঠে ঠান্ডা হয়। এর ফলে জলীয় বাষ্প জমে জলকণা তৈরি হয়। বাষ্প জমে জল হলে লীনতাপ বেরিয়ে আসে। এই লীনতাপের প্রভাবে বাষ্প ও জলকণাভরা বায়ু আশপাশের বায়ুর তুলনায় গরম ও হালকা থাকে। এজন্যে এই বায়ু (এতক্ষণে জলকণা জমে এই বায়ুতে মেঘ তৈরি হয়েছে) আরও উপরে উঠতে থাকে। এ কারণে ঝড়ের মেঘের উচ্চতা 12 - 13 কিলোমিটার বা তার চেয়েও বেশি হয়। এতটা উপরের মেঘে জল জমে বরফের ছোটো ছোটো টুকরোও গঠিত হয়।

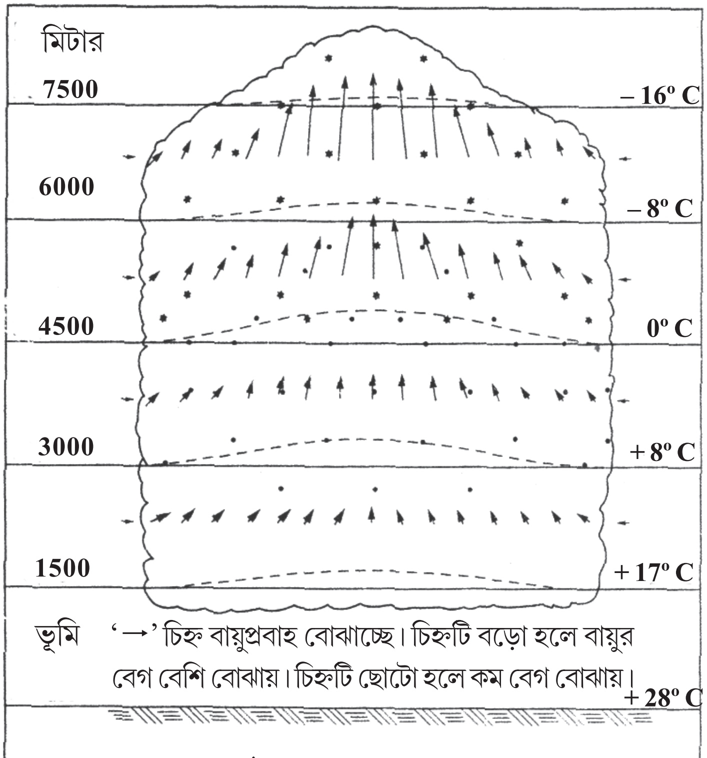

বজ্রগর্ভ মেঘ গঠিত হচ্ছে

কোনো একটা সময়ে জলকণাগুলো এতটা ভারী হয় যে মাধ্যাকর্ষণের টানে তা নীচে নামতে থাকে। বায়ুর উপরের দিকের গতিও তখন এই জলকণাগুলোর নীচে পড়া আটকাতে পারে না। ততক্ষণে ঝড়ের মেঘের গঠন সম্পূর্ণ হয়েছে। একটা সময়ে বায়ুও হঠাৎ করে নীচে নামতে শুরু করে। এরকম অবস্থায় ভূপৃষ্ঠে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়।

ঝড়ে মেঘের এই উপরে ওঠা এবং নীচে নামার সময়েই জলকণাগুলো তড়িৎগ্রস্ত (Charged) হয়। এই তড়িৎ আধান আসে কোথা থেকে? বায়ুতে আগে থেকেই যে বিভিন্ন ধরনের আহিত কণা রয়েছে সেগুলোই জলকণার গায়ে জমে। যে জলকণাগুলো নীচের দিকে নামছে সেগুলোয় সাধারণত ঋণাত্মক আধান জমা হয়। আর যে জলকণাগুলো উপরে উঠছে সেগুলোয় ধনাত্মক আধান জমে। এর ফলে মেঘের নীচের দিকটা সাধারণত ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মেঘের উপরের দিকটায় থাকে ধনাত্মক আধান। ভূপৃষ্ঠ ও উপরের আকাশের মধ্যে বিভব পার্থক্য আছে। এজন্যেই ভিন্ন আধানগুলো মেঘের মধ্যে দুটো আলাদা অঞ্চলে জমা হয়।

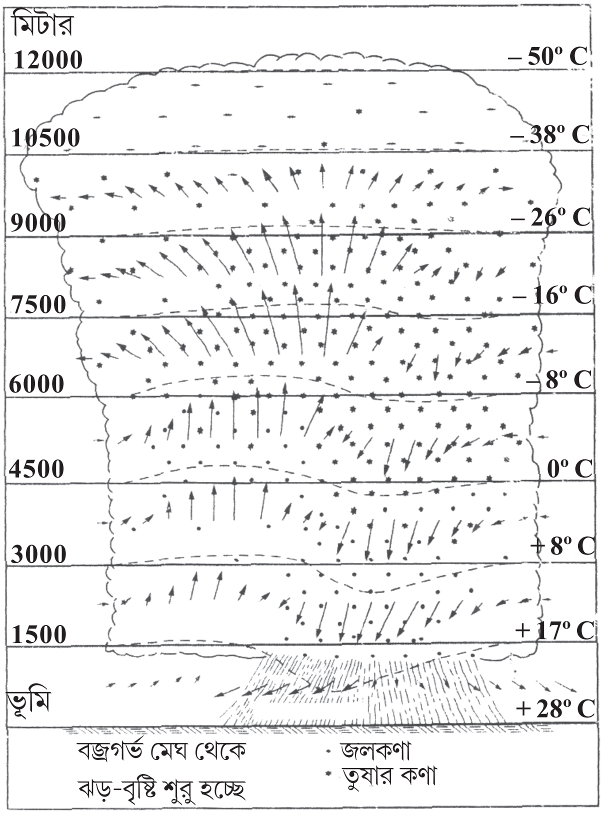

নীচের দিকের ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত মেঘ মাটির কিছুটা কাছে এলে আবেশের ফলে মাটিতে ধনাত্মক আধান জমা হয়। সাধারণ সময়ে মাটি সামান্য ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত। কিন্তু মেঘের নীচের দিকটা প্রবলভাবে ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত। এজন্যে আবেশের ফলে মাটিতে ধনাত্মক তড়িৎ জমে। মেঘ ও মাটির বিভব পার্থক্য খুবই বেশি হলে অত্যন্ত বড়ো স্ফুলিঙ্গের আকারে ঋণাত্মক তড়িৎ আধান মেঘ থেকে মাটিতে চলে আসে। এর ফলে যে ক্ষণস্থায়ী কিন্তু প্রবল তড়িৎ প্রবাহ হয় তাতে বায়ু অত্যন্ত গরম হয়ে যায়। এই অতিগরম বায়ুই আলো বিকিরণ করে। এই প্রবল গরমে বাতাসে সাময়িক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এর ফলে বায়ুতে প্রবল কম্পন তৈরি হয়। বায়ুর এই কম্পনই বজ্রপাতের সময়ে শব্দ উৎপন্ন করে। বিভব পার্থক্য তৈরি হলে দুটো আলাদা মেঘের মধ্যে বজ্রপাত ঘটতে পারে। একই মেঘের বিভিন্ন অংশের মধ্যেও বজ্রপাত হতে পারে।

বজ্রপাতের ক্ষতি থেকে রেহাই পাব কীভাবে?

বজ্রপাতের ফলে আমাদের সম্পদ নষ্ট হতে পারে। জীবনহানিও ঘটতে পারে। এজন্যে আমাদের সাবধান হওয়া জরুরি। বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা মোটেই নিরাপদ নয়। বজ্রের শব্দ শুনেই আমাদের উচিত নিরাপদ জায়গায় পৌঁছোনো। বজ্রের শব্দ শেষবার শোনার বেশ কিছুক্ষণ পর বাইরে বেরোনো যেতে পারে।

নিরাপদ স্থান

বাড়ির মধ্যে থাকলে জানালা-দরজা বন্ধ রাখা উচিত। পাকা বাড়ির মধ্যে থাকা নিশ্চয়ই নিরাপদ। খোলা বারান্দায় থাকা উচিত নয়। জানালা-দরজা বন্ধ অবস্থায় চলন্ত বাস, মোটরগাড়ি বা রেলগাড়ি নিরাপদ।

বজ্রপাতের সময় কী করা উচিত অথবা কী করা উচিত নয়

যদি তুমি বাইরে থাকো

খোলা গাড়ি, মোটরবাইক বা ট্রাক্টর মোটেই নিরাপদ নয়। খোলা মাঠে ,উঁচু গাছের কাছে, কোনো খোলা উঁচু জায়গায় বা পার্কের ছাউনির নীচে একেবারেই থাকবে না। বজ্রপাতের মধ্যে ছাতা নিয়ে বাইরে বেরোনো মোটেই ঠিক নয়। যদি কোনো কারণে জঙ্গলের গাছপালার মধ্যে থাকতে বাধ্য হও তাহলে অবশ্যই নীচু গাছের আশেপাশে থাকো, মোটেই উঁচু গাছের ধারেকাছে নয়।

নিরাপদ জায়গায় পৌঁছোতে পারছ না, খোলা মাঠেই থাকতে বাধ্য হচ্ছ এমন হলে পাশের ছবিতে যেমন দেখছ তেমনভাবে বসে থাকো।

বাড়ির মধ্যে যদি থাকো

বাড়িতে যেসব বিদ্যুৎবাহী তার বা ধাতুর তৈরি পাইপ আছে সেগুলো থেকে দূরে থাকো। ল্যান্ডফোন মোটেই ব্যবহার করবে না। মোবাইল ফোন নিরাপদ, কিন্তু তোমার সঙ্গে অন্যপ্রান্তে যে কথা বলছে সে হয়তো ল্যান্ডফোন ব্যবহার করছে আর সেখানেও বজ্রপাত হচ্ছে। তাই ফোন না করাই ভালো । বিভিন্ন তড়িৎ যন্ত্রের (টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর) তড়িৎ সংযোগ খুলে রাখো। আলো জ্বালিয়ে রাখা যাবে। মগ দিয়ে বালতির জল ব্যবহার করতে পারো কিন্তু পাইপের মাধ্যমে আসা জল খুলে কোনো কাজ করবে না।

বজ্র নিরোধক (Lightning Conductors)

বজ্রপাত থেকে বাড়ি এবং বাড়ির মধ্যের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম রক্ষা করে বজ্র নিরোধক। পাশের ছবিটা দেখো। বাড়িটার সবচেয়ে উঁচু স্থানে একটা ধাতুর দণ্ড শক্তভাবে আটকানো আছে। দণ্ডটির সবচেয়ে উঁচু স্থানে খুব সরু কয়েকটা ছোটো ছোটো ধাতব শলাকা আছে। মাটির মধ্যে 5-6 ফুট নীচে একটা চওড়া ধাতব পাত পুঁতে রাখা আছে। এবারে একটা সুপরিবাহী মোটা তার দিয়ে ওই দণ্ডটি এবং পাতটি যুক্ত করা হয়। এই ব্যবস্থাই বাড়িকে বজ্রপাতের থেকে বাঁচায়। বজ্রপাতের ফলে যে প্রবল তড়িৎপ্রবাহ হয় তা ওই তারের মাধ্যমে মাটিতে চলে যায়। বাড়িটাতে বজ্রপাত হলেও বাড়িটার কোনো ক্ষতি হয় না।

মহামারি

নানা সংক্রামক রোগঘটিত মহামারি

নানা কারণে মহামারি হয়। কোনো মারণরোগের প্রাদুর্ভাবে প্রতি বছর প্রচুর মানুষ যখন একসঙ্গে মারা যান, তখন ওই মারণরোগকে মহামারি বলে ঘোষণা করা হয়।

কোনো রোগ মহামারিতে পরিণত হবে কিনা তা কী করে বোঝা সম্ভব —

- রোগটির লক্ষণ কী?
- রোগটি কতটা এলাকা জুড়ে ছড়িয়েছে?
- কোথায় এর প্রথম অস্তিত্ব ধরা পড়েছে?
- কখন এই ঘটনাটি ঘটেছে?
- কারা কারা এতে আক্রান্ত হয়েছেন?
- কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটল?
- কী কী ব্যবস্থা নিলে এই রোগটিকে এড়ানো যেতে পারত?
- কী করলে এই রোগের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব?

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মধ্যেই লুকিয়ে আছে কলেরা, ম্যালেরিয়া, AIDS, ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো মহামারি হওয়ার বা না হওয়ার সম্ভাবনা।

মহামারির প্রকারভেদ —

১. সাধারণ উৎস মহামারি — এধরনের মহামারি কোনো রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর জন্য হতে পারে, আবার নাও হতে পারে (জল, বায়ু, খাদ্য বা মাটির বিষক্রিয়াজনিত। যেমন ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডি বা জাপানের মিনামাটা রোগ)।

২. সংক্রামক মহামারি — এধরনের মহামারি সরাসরি এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তিতে, কোনো বাহক প্রাণীর মাধ্যমে বা কোনো প্রাণীজ দেহ থেকে সংক্রামিত হতে পারে (হাম, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া)।

৩. অসংক্রামক রোগঘটিত মহামারি — ফুসফুসের ক্যানসার, করোনারি হার্ট ডিজিজ।

কোনো কোনো মহামারি জাতীয় রোগের আবির্ভাব চক্রাকার হয় (দিন/সপ্তাহ/মাস/বছর)। টিকাকরণের আগে হাম সাধারণত 2 - 3 বছর অন্তর অন্তর, ইনফ্লুয়েঞ্জা 7 - 10 বছর অন্তর অন্তর মহামারি রূপে ফিরে আসত। আবার কোনো কোনো রোগের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে 'ক্রমাগত বৃদ্ধি বা হ্রাসের' প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন উন্নত দেশগুলোতে গত 50 - 70 বছর ধরে করোনারি হার্ট ডিজিজ, ফুসফুসের ক্যানসার, ডায়াবেটিসের ঘটনা বেড়েই চলেছে। আবার ওই দেশগুলোতে যক্ষ্মা, টাইফয়েড জ্বর, ডিপথেরিয়া ও পোলিও-র মতো রোগের ঘটনা কমার লক্ষণ দেখা গেছে। কোনো কোনো মহামারির সঙ্গে আবার ঋতুর নিবিড় সম্পর্ক আছে। বসন্তের শুরুতে হাম, জলবসন্তের মতো রোগ বেশি করে হয়। শীতের মাসগুলোতে শ্বাসনালীর উপরের অংশে সংক্রমণের ঘটনা বেশি ঘটে, আবার গরমকালে পেটের সংক্রমণ বেশি দেখা যায়।

কলেরা — সাধারণত দূষিত জল, মাছি-বসা, না-ঢাকা খাবার এবং নোংরা পরিবেশ থেকেই এই রোগের সৃষ্টি হয়। শরীর থেকে সব জল বেরিয়ে যেতে থাকে। প্রচণ্ড বমি হয়। শরীরে অম্ল-ক্ষারের ও লবণের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। শরীরের চামড়াকে ধোঁয়াটে নীল করে দেয়। কলেরা হলো মারণরোগ। তাই ঠিক সময়ে ঠিক চিকিৎসা প্রয়োজন। কলেরা রোগের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়ার নাম হলো - *Vibrio cholerae*।

উনিশের শতকে গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে প্রথম কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তারপর সেখান থেকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় সবকটি মহাদেশেই কলেরা আক্রান্ত হয়ে প্রচুর মানুষের মৃত্যু ঘটে।

ম্যালেরিয়া — ম্যালেরিয়া কথাটির অর্থ হলো খারাপ বায়ু বা bad air। এটি একটি মশাবাহিত রোগ। স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা কামড়ালে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত থেকে *Plasmodium vivax* বা *Plasmodium falciparum* নামক প্রোটোজোয়া মশকীর দেহে প্রবেশ করে। এরপর ওই প্রোটোজোয়া মশকীর দেহে বংশবৃদ্ধি করে। পরে ওই মশকী সুস্থ মানুষকে কামড়ালে প্রোটোজোয়া সেই মানুষের দেহে প্রবেশ করে। মানুষটি তখন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। বর্ষাকালে, গরম, ঠান্ডা ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় এই রোগের প্রকোপ বাড়ে। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। ঘাম দিয়ে জ্বর সেরে যায়, মাথার যন্ত্রণা, যকৃৎ ও প্লীহা বড়ো হয়ে যায়। গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা, গোটা শরীরে ব্যথা। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা না করালে মারা যাবার সম্ভাবনা থাকে।

সমীক্ষায় দেখা গেছে 2012 সালে পৃথিবী জুড়ে ম্যালেরিয়া রোগে প্রায় 6 লক্ষ 60 হাজার মানুষ মারা গেছেন। ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে সচেতনতার জন্য 25 এপ্রিল দিনটিকে বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

ডেঙ্গি — কলকাতায় এই মশাবাহিত মারণরোগের প্রথম দেখা মেলে 1963-64 সালে। *Aedes egypti* মশা এই রোগের জীবাণু বহন করে। এই রোগের জীবাণু ফ্ল্যাভিভাইরাস নামে পরিচিত। ভয়াবহ জ্বর, মাথার যন্ত্রণা, গাঁটে গাঁটে ব্যথা, অণুচক্রিকার সংখ্যা ভয়াবহভাবে হ্রাস পেয়ে রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেওয়া। রক্তক্ষরণ এই রোগের প্রধান উপসর্গ। শ্বেতরক্তকণিকা ধ্বংস করে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমিয়ে দেয়। সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা না হলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

তোমরা দলে আলোচনা করো। তারপর খোঁজখবর নিয়ে মশাবাহিত ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গি প্রতিরোধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা লেখো।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে প্রতি বছর প্রায় ছয় হাজারের মতো মানুষ মারা যান এই ভয়াবহ মারণরোগে।

প্লেগ — ইঁদুর থেকে মানুষের দেহে এই রোগ সংক্রামিত হয়। *Yersinia pestis* নামক ব্যাকটেরিয়া এই রোগের জন্য দায়ী। ফুসফুসে সংক্রমণ, রক্তক্ষরণ, লসিকাগ্রন্থি ফুলে গিয়ে ভয়াবহ যন্ত্রণা, মাথার যন্ত্রণা,বমি, কাশির সঙ্গে রক্ত পড়া এই রোগের প্রধান উপসর্গ। নানাভাবে এই রোগ সংক্রামিত হতে পারে। হাঁচির মাধ্যমে, সরাসরি শরীরের ছোঁয়ায়, দূষিত মাটির স্পর্শে, বাতাস থেকে, এমনকি কিছু পতঙ্গের কামড়েও। *Xenopsylla cheopis* নামে মাছি প্লেগ রোগে আক্রান্ত ইঁদুরের দেহ থেকে এই ব্যাকটেরিয়া বহন করে। তারপর যদি কোনো

মানুষকে কামড়ায় বা খাবারে বসে সেখান থেকে অবধারিতভাবে প্লেগ হবে। 1897 সালে তৎকালীন বোম্বেতে ভালডেমার হাফকিন প্লেগ রোগের টিকা আবিষ্কার করেন। তবে মানুষের সচেতনতা এবং ঠিক সময়ের চিকিৎসার দ্বারা এই রোগকে অনেকটাই এড়ানো সম্ভব।

প্লেগ হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা পরিগণিত প্রথম তিনটি মহামারির একটি। অন্য দুটি হলো কলেরা আর পীতজ্বর, অত্যন্ত ভয়াবহ মারণরোগ।

স্মল পক্স (গুটি বসন্ত) — এই রোগের আরেক নাম রেড প্লেগ। স্মল পক্স এক ভাইরাসঘটিত ভয়াবহ মারণরোগ। চামড়ার শিরা-উপশিরায়,মুখে গলায় এই রোগের সংক্রমণ ঘটে। গোটা জায়গাটি তরলভরতি ফোসকায় ভরে ওঠে। তবে এই রোগকে অনেকটাই কাবু করা সম্ভব হয়েছে টিকা আবিষ্কারের ফলে। খাঁজকাটা সূচের সাহায্যে ত্বকের ওপর এই টিকা দেওয়া হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার টিকা দিয়ে স্মল পক্স নির্মূলকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে বর্তমানে স্মল পক্সকে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে।

1796 সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড জেনার গো-বসন্তের ভাইরাসকে স্মল পক্সের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে কাজে লাগান। তারপর থেকে এই ভয়াবহ মারণরোগ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে।

কালাজ্বর — কালাজ্বরের আরেক নাম দমদম জ্বর। লিশম্যানিয়া নামক প্রোটোজোয়া বা আদ্যপ্রাণীর আক্রমণে এই রোগ হয়। ধারাবাহিক জ্বর, খিদে কমে যাওয়া, ওজন কমে যাওয়া, প্লীহা বড়ো হয়ে যাওয়া, অ্যানিমিয়া প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ। তবে এই আদ্যপ্রাণীটি সরাসরি মানুষের দেহে প্রবেশ করে না। বাহকের ওপর নির্ভরশীল। বেলেমাছি এই আদ্যপ্রাণীটির বাহক।

গোটা পৃথিবীতে প্রায় 59 হাজারের মতো মানুষ প্রতি বছর এই রোগে মারা যান। 1901 সালে ব্রিটিশ চিকিৎসক লিশম্যান দমদমে এক রোগীর দেহে এই রোগের জন্য দায়ী জীবাণুটিকে প্রথম লক্ষ করেন। খুব শীঘ্রই তৎকালীন মাদ্রাজে ক্যাপটেন চার্লস ডোনোভ্যান লিশম্যানের আবিষ্কারের সত্যতা মেনে নেন। তাই এই রোগের জীবাণুটির নাম- *Leishmania donovani* । ভারতীয় বিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী 1922 সালে কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কার করেন। তার ফলে লক্ষাধিক মানুষকে এই রোগের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

ডায়ারিয়া — এই শব্দের অর্থ হলো প্রবাহিত হওয়া। তিনবারের থেকে বেশিবার পাতলা মলত্যাগ হলেই সাবধান হওয়া দরকার। শরীর থেকে অনেকটা জল বেরিয়ে যায়। শরীরের পাচক রস নষ্ট হয়ে যায়। মল দিয়ে রক্ত পড়ে। শরীরের জলসাম্য, অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য এমনকি লবণের ভারসাম্যও নষ্ট হয়ে যায়। দূষিত জল খাওয়া, অরক্ষিত খাবার থেকেও এই রোগ ছড়াতে পারে। এই রোগের জন্য দায়ী হলো একধরনের রোটাভাইরাস। বাড়িতে ওআরএস বানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ালে এই রোগকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। তবে রোগের উপসর্গ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়া খুবই জরুরি।

তোমরা দলে মিলে আলোচনা করে কীভাবে ওআরএস বানানো হয় তা লেখো —

সমীক্ষায় দেখা গেছে 2011 সালে গোটা বিশ্বে প্রায় 1 লক্ষ 60 হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন ডায়ারিয়াতে। তার মধ্যে বেশিরভাগই পাঁচ বছর বয়সের শিশু।

মহামারি কোনো জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকতেও পারে আবার তা ছড়িয়ে পড়তে পারে দেশে-বিদেশে।

SARS - ভাইরাসঘটিত Severe Acute Respiratory Syndrome 2003 সালে প্রথম দেখা যায় এশিয়াতে। তারপর ছড়িয়ে পড়ে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়, ইউরোপে। প্রবল জ্বর, মাথার যন্ত্রণা, শরীরের ব্যথায় অনেক মানুষ মারা গিয়েছে ভয়াবহ এই ছোঁয়াচে রোগে। রাস্তাঘাটে মানুষ নাকমুখ চাপা দেওয়া মুখোশ পরে এই রোগের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করতো।

যক্ষ্মা (Tuberculosis) — যক্ষ্মা বা টিবি ব্যাকটেরিয়াঘটিত বায়ুবাহিত মারণরোগ। এই রোগের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়ার নাম— *Mycobacterium tuberculosis*। এই ব্যাকটেরিয়া মানুষের ফুসফুসকে আক্রমণ করে। অন্ত্র ও হাড়েও যক্ষ্মা হয়। এই রোগ ভীষণ ছোঁয়াচে, বায়ুবাহিত। কফ, কাশি এমনকি থুতু ও লালার মাধ্যমে সংক্রামিত হতে পারে। এই রোগের লক্ষণ হলো ভয়াবহ কাশি ও তার সঙ্গে রক্ত পড়া। রাতের দিকে কষ্ট বাড়ে। প্রচণ্ড ঘাম হয়, ওজন ক্রমশ কমতে থাকে। যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসা দ্বারা যক্ষ্মা রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। *DOTS* বা *Directly Observed Treatment, Short-Course* -এর মাধ্যমে গোটা বিশ্বে অনেক মানুষকে এই মারণরোগের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে।

> 2012 সালে গোটা বিশ্বে 8 কোটি 6 লক্ষ মানুষের মধ্যে যক্ষ্মা ধরা পড়ে। প্রায় 1 কোটি 3 লক্ষ মানুষ মারা যান। তার মধ্যে 74000 শিশু মারা যায় এই মারণরোগে। প্রায় 22 লক্ষ মানুষকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে *DOTS* -এর মাধ্যমে।

হেপাটাইটিস — হেপাটাইটিস হলো ভাইরাসঘটিত মারণরোগ। প্রধানত যকৃৎকে আক্রমণ করে। পাঁচরকমের হেপাটাইটিস হয় — *A,B,C,D* এবং *E*। এই পাঁচরকম হেপাটাইটিস ভাইরাসের আক্রমণে প্রতিবছর বহু মানুষের মৃত্যু ঘটে। যকৃৎকে এই ভাইরাস নষ্ট করে দেয়। *A* এবং *E* দূষিত খাবার ও জল থেকে সংক্রামিত হয়, আর *B, C* এবং *D* সংক্রামিত মানুষের দেহরস বা রক্তের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়। এই ভাইরাসের সংক্রমণে জন্ডিস, বমি, পেটব্যথা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হেপাটাইটিস রোগটিকে নির্মূল করার জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

> **গোটা পৃথিবী জুড়ে হেপাটাইটিস *B* ও *C*-এর আক্রমণে 2010 সালে 14 লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 28 জুলাই দিনটিকে বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছেন।**

ইনফ্লুয়েঞ্জা/ফ্লু — ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসঘটিত ভয়াবহ শ্বাসরোগ। ভীষণ ছোঁয়াচে রোগ, হাঁচি, কাশি, কফের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়। কোনো অসুস্থ মানুষের লক্ষণ আসার আগে থেকে শুরু করে অসুস্থ হবার পর পর্যন্ত এই রোগ সংক্রমণ হতে পারে। অর্থাৎ নিজে জানা বা বোঝার আগেই এই রোগ সংক্রামিত হতে পারে। ভয়াবহ জ্বর,ঘাম, কাঁপুনি,মাথার যন্ত্রণা, গাঁটে গাঁটে ব্যথা, অত্যধিক দুর্বলতা, বমি, ডায়ারিয়া হলো এই রোগের লক্ষণ। তবে ভাইরাসঘটিত রোগ হওয়ার ফলে অ্যান্টিবায়োটিক খুব একটা কাজ করতে পারে না। তবে এই রোগ হলে বাড়িতে থেকে পুরোপুরি বিশ্রাম নিলে, প্রচুর পরিমাণে জলপান করলে রোগের কিছুটা উপশম হয়। এই রোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শিশু, বৃদ্ধ, স্বাস্থ্যকর্মীদের ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকাকরণের কথা বলেছেন।

> নানা ধরনের ফ্লু ঘটতে দেখা যায়। তার মধ্যে সোয়াইন ফ্লু, বার্ড ফ্লু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 2013 সালে ভারতে এখনও পর্যন্ত 254 জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

এইডস, AIDS — Acquired Immuno Deficiency Syndrome — গত তিন দশকে প্রায় আড়াই কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটেছে এই ভয়াবহ মারণরোগে। দায়ী ভাইরাসের নাম HIV - Human Immunodeficiency Virus। এই ভাইরাসের আক্রমণে দেহের প্রতিরোধক্ষমতা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। অন্যান্য নানা রোগজীবাণুর আক্রমণে রোগী নানা রোগে আক্রান্ত হয়। যক্ষ্মা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডায়ারিয়া, জ্বর, যন্ত্রণা, গলা ব্যথা থেকে শুরু করে দ্রুত ওজন হ্রাস পেয়ে মানুষ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। রক্তের মাধ্যমে, দেহরসের মাধ্যমে, লালার মাধ্যমে দ্রুত সংক্রামিত হয় এই রোগ। এই রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা কর্মসূচির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

2012 সালেই প্রায় 3 কোটি 53 লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এই রোগে। এই রোগের হাত থেকে বাঁচার উপায় খোঁজার পালা এখনও চলছে।

দলে আলোচনা করে নীচের তালিকা পূরণ করো :

	রোগের নাম	যেভাবে ছড়ায়	দায়ী জীবাণুর নাম	কীভাবে এড়ানো সম্ভব
মহামারি	**1.** কলেরা	আঢাকা খাবার, নোংরা পরিবেশ	*Vibrio cholerae*	
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			

অসংক্রামক রোগঘটিত মহামারি

বেশ কিছু অসংক্রামক রোগ যেমন ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, ক্যানসার, মানসিক অসুস্থতাও মহামারির আকার ধারণ করেছে। ঠিক খাদ্যাভ্যাস ও জীবনচর্যার অভাবে এইসব রোগ ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে।

বিভিন্ন ধরনের খাবারের অভ্যাস ও জীবনচর্যা আমাদের শরীরে কী কী অসুবিধা তৈরি করতে পারে তা আলোচনা করে লেখো—

খাদ্যাভাস ও জীবনচর্যা	কী কী অসুবিধা তৈরি করতে পারে
1. অতিরিক্ত পরিমাণে লিপিড জাতীয় খাদ্যগ্রহণ	
2. অতিরিক্ত পরিমাণে শর্করা জাতীয় খাদ্যগ্রহণ	
3. রাতজাগা ও কম ঘুমানো	
4. কম্পিউটারের সামনে বসে দীর্ঘসময় কাজ করা	
5. ধূমপান করা ও নেশার বস্তু গ্রহণ করা	
6. মোবাইল ফোনের অত্যধিক ব্যবহার	

6 জীবদেহের গঠন

জীবদেহের গঠনের ধাপসমূহ

তোমার চারদিকে তাকাও। দেখতে পাচ্ছ এমন পাঁচটি জিনিসের নাম লেখো। তুমি কীভাবে এদের শ্রেণিবিভাগ করতে পারো—জড় না সজীব? এই তালিকায় কী এমন কোনো জিনিস আছে যা চলাচল করতে পারে বা পরিবেশের উদ্দীপনায় সাড়া দেয়। লজ্জাবতী বা মানুষ সজীব, কিন্তু পড়ে থাকা কাঠকে কেন আমরা জড় বলি?

সজীবরা শ্বাস নেয়, খাদ্য হজম করে, দেহে উৎপন্ন বর্জ্য বের করে দেয় এবং নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। এধরনের এক বা একাধিক কাজ করতে সজীব দেহে কী থাকে?

- খাদ্য হজম করার জন্য পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র।
- শ্বাসবায়ু নেওয়া ও ছাড়ার জন্য ফুসফুস।
- রক্তকে দেহের দূরতম প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য হৃৎপিণ্ড।
- দেহের বর্জ্যকে মূত্রের মাধ্যমে বের করে দেওয়ার জন্য বৃক্ক।
- উদ্দীপনা গ্রহণ ও তাকে উত্তেজনায় রূপান্তরের জন্য মস্তিষ্ক।

এসব অঙ্গে কী এমন থাকে যা এসব অঙ্গের বিশেষ গঠনে ও কাজে সাহায্য করে?

এবার এসো দেখা যাক, একটা বাড়ি ও একটা জীবদেহ কীভাবে ধাপে ধাপে গঠিত হয়—

বাড়ি	জীবদেহ
↓	↓
ঘর	অঙ্গ (ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক)
↓	↓
দেয়াল, ছাদ, মেঝে	কলা
↓	↓
ইট	কোশ

→

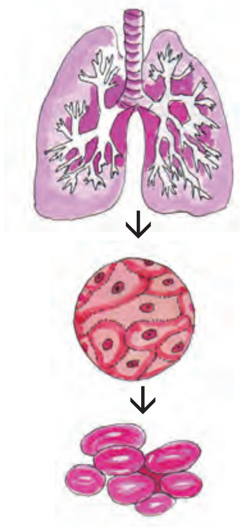

বাড়ির ক্ষুদ্রতম গঠনগত অংশ হলো ইট। তেমনি জীবদেহ গঠনেরও ক্ষুদ্রতম একক হলো কোশ। আবার জীবদেহ যে কাজগুলো করে তাও কোশেই সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ কোশ হলো জীবদেহের এমন এক ক্ষুদ্রতম একক যা যেকোনো কাজ করতে পারে।

টুকরো কথা

কোনো জীবদেহের গঠনগত ও কার্যগত ক্ষুদ্রতম একক হলো কোশ। এরা এতই ছোটো যে **মাইক্রোস্কোপ** ছাড়া সাধারণত এদের খালি চোখে দেখা যায় না।

মাইক্রোস্কোপ

কী করে এই কোশের কথা জানা গেল ?

1665 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী রবার্ট হুক গাছের কাণ্ডের ছাল নিয়ে তার একটি সূক্ষ্ম প্রস্থচ্ছেদ তৈরি করেন। তারপর নিজের তৈরি মাইক্রোস্কোপের নীচে ওই প্রস্থচ্ছেদ দেখার সময় মৌচাকের প্রকোষ্ঠের মতো অসংখ্য কুঠুরি লক্ষ করেন। তিনি এদের Celluliae (ল্যাটিন অর্থ ঘর) বলে আখ্যা দেন। পরে এদেরই তিনি Cell (কোশ)নাম দেন।

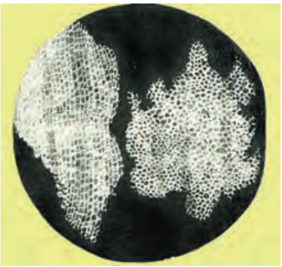

তুমি কী করে একটি কোশকে দেখতে পারো ?

খালি চোখে কোশ দেখা যায় না। দেখতে গেলে একে বহুগুণে বড়ো করা দরকার। এর জন্য আমরা লেন্সযুক্ত যে যন্ত্র ব্যবহার করি তা হলো মাইক্রোস্কোপ (Microcope)।

লিভেনহিক

টুকরো কথা

রবার্ট হুক কর্কের পাতলা ছেদ পরীক্ষা করার সময় যে কোশগুলি লক্ষ করেছিলেন সেগুলি ছিল মৃত। 1674 খ্রিস্টাব্দে ডাচ বিজ্ঞানী লিভেনহিক প্রথম সজীব কোশ পর্যবেক্ষণ করেন। মাইক্রোস্কোপের উন্নতি ঘটিয়ে তিনি নানা অণুজীব ও রক্তকোশ পর্যবেক্ষণ করেন।

কোশের গঠনকে ভালভাবে বুঝতে গেলে নানা রঙের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এদের রঞ্জক পদার্থ (Stain) বলে।

- কোশের গঠন পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রথমদিকে সরল আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Simple Light Microscope) ব্যবহার করা হতো। এতে একটিমাত্র লেন্সের সাহায্য নেওয়া হতো। ফুল কেটে তার অংশবিশেষ দেখার জন্য এই ধরনের অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা হতো। এটা বস্তুকে 15-20 গুণ বড়ো করে দেখাতে সক্ষম।

- এরপর এলো যৌগিক আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Compound Light Microscope)। এতে দ্রষ্টব্য বস্তুকে অনেকগুণ বড়ো করে দেখানোর জন্য বিবর্ধন ক্ষমতা সম্পন্ন একাধিক লেন্স (অকিউলার লেন্স, অবজেকটিভ লেন্স) ব্যবহার করা হয়। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান আলো দ্বারা দ্রষ্টব্যবস্তুকে আলোকিত করা হয়। এর জন্য একটি বিশেষ ধরনের আয়নার (Mirror) সাহায্য নেওয়া হয়। এই ধরনের লেন্স ব্যবহারের ফলে দ্রষ্টব্য বস্তুকে 2000-4000 গুণ বড়ো করে দেখা সম্ভব।

যৌগিক আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয়?

- ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল, ছত্রাক, বিভিন্ন এককোশী ও বহুকোশী প্রাণীর দেহের বহির্গঠন জানার জন্য।
- উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অংশের (মূল, কাণ্ড ও পাতা) অন্তর্গঠন পর্যবেক্ষণের জন্য।
- জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও তার প্রস্থচ্ছেদ করে তার কলার গঠন জানার জন্য।
- কোশের ভেতরের অঙ্গাণু ও কোশের বাইরের পর্দার গঠন জানার জন্য।

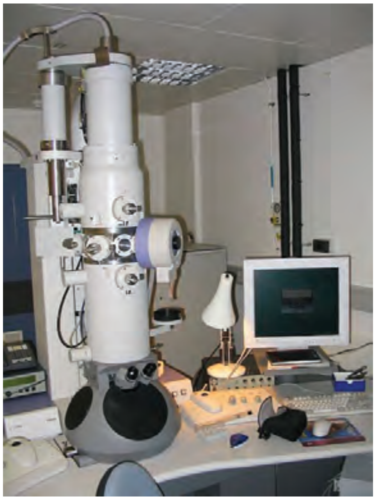

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Electron Microscope) : এই যন্ত্রে আলোর পরিবর্তে দ্রুতগতির ইলেকট্রন প্রবাহ দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কাচের লেন্সের পরিবর্তে তড়িৎচুম্বক ব্যবহার করা হয়। দ্রষ্টব্য বস্তুকে 50,000-3,00,000 গুণ বড়ো করে দেখা যায়। দ্রষ্টব্য বস্তুকে দেখার জন্য ফোটোগ্রাফিক ফিল্ম ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে ভাইরাস ও অন্যান্য অণুজীবকে অনেক বড়ো করে দেখা সম্ভব। এছাড়াও কোশের মধ্যের অঙ্গাণুগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ গঠন জানা সম্ভব হয়।

কোশের বৈচিত্র্য

কার দেহে কত কোশ আছে?

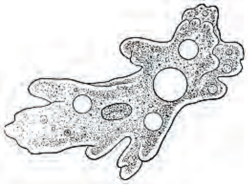

ওপরের বিভিন্ন জীবকে লক্ষ করে ছোটো থেকে বড়ো আকার (Size) অনুযায়ী সাজাও।

(1) .... (2) .... (3)........................(4) ....

ওপরের সব জীবদেহের গঠন কিন্তু একরকম নয়। কোনো জীবের আকার (Size) যত বড়ো হয় তার দেহে কোশের সংখ্যা তত বেশি হয়।

অ্যামিবার দেহ একটি কোশ নিয়ে গঠিত। অর্থাৎ একটি কোশ একটি জীবদেহের সমতুল্য। এরা এককোশী (Unicellular)। মশা, বিড়াল ও হাতির দেহ অসংখ্য কোশ নিয়ে গঠিত। কোশের সংখ্যা সঠিকভাবে গোনা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এই ধরনের জীবরা বহুকোশী (Multicellular)। বহুকোশী জীবে বিভিন্ন জীবন প্রক্রিয়া একই সঙ্গে ও অবিচ্ছিন্নভাবে ঘটতে পারে। পরিবর্তনশীল পরিবেশে বহুকোশী জীবের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

কোশ দেখতে কেমন? নীচের ছবিগুলো দেখে কোশের আকৃতি (Shape) কতরকম হতে পারে তা লেখো।

নানা ধরনের প্রাণীকোশ

নানা ধরনের উদ্ভিদকোশ

বিভিন্ন জীবের ক্ষেত্রে কোশের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন (ডিম্বাকার, আয়তাকার, বহুভুজাকার, স্তম্ভাকার, লম্বাটে, সূত্রাকার ইত্যাদি) হয়। বহুকোশী কোনো জীবের দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কোশের আকৃতি কাজের উপর নির্ভর করে।

প্রাণীদেহে চামড়ার নীচে বা অন্যান্য অঙ্গে ফ্যাট সঞ্চয়ী চর্বিকোশ থাকে। চর্বি জমা হওয়ার ফলে কোশের নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম সহ একদিকে সরে যায়। ফলে চর্বিকোশকে আংটির মতো দেখায়। চোখের রেটিনায় মৃদু আলো শোষণে সক্ষম দণ্ডাকার রডকোশ এবং উজ্জ্বল আলো ও বর্ণ শোষণে সক্ষম শঙ্কু আকৃতির কোণ (Cone) কোশ দেখা যায়। উদ্ভিদের বীজের আবরণ ও ফলত্বকে উপস্থিত প্রস্তরকোশে প্রোটোপ্লাজম না থাকায় কোশগুলি দণ্ডাকার, স্তম্ভাকার বা তারার মতো আকৃতি বিশিষ্ট হয়। কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়ার কোশ গোলাকার, রডের মতো বা কমা চিহ্নের মতো হয়। আবার স্পাইরোগাইরার মতো শৈবালের সূত্রাকার দেহ কতগুলো আয়তাকার কোশ দ্বারা গঠিত। কোশের বয়স, কোশমধ্যস্থ চাপ ও অন্যান্য শর্ত কোশের আকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে।

• নীচে অ্যামিবার আকৃতি লক্ষ করো। এর আকৃতি অনিয়মিত । অ্যামিবার আকৃতি অন্য জীবকোশের মতো নয়। সর্বদাই এর আকৃতি (Shape) পরিবর্তিত হয়। অ্যামিবার দেহের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেরোনো বিভিন্ন মাপের অংশগুলো লক্ষ করো। এগুলোর নাম হলো ক্ষণপদ। ক্ষণপদ কখনও তৈরি হয় আবার পর মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়। এগুলো অ্যামিবার চলাফেরায় সাহায্য করে।

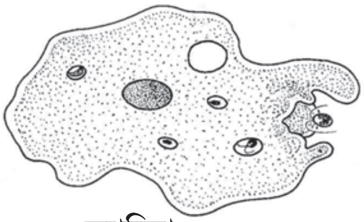
অ্যামিবা

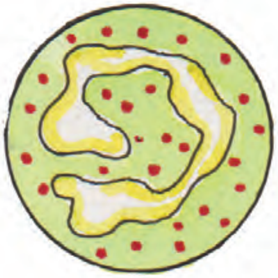
শ্বেত রক্তকণিকা

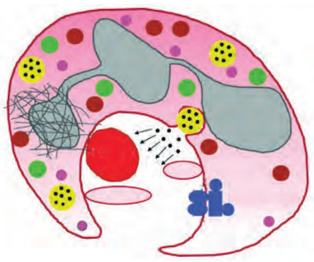
আগ্রাসী শ্বেত রক্তকণিকা

মানুষের রক্তে জীবাণুকে মেরে ফেলার জন্য শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। এরাও অ্যামিবার মতো নিজেদের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে। তবে মনে রেখো অ্যামিবা একটি স্বাধীন জীব। আর শ্বেত রক্তকণিকা একটি জীবদেহের কোশ।

আমাদের দেহের কোশগুলো কোনটা কেমন?

লোহিত রক্তকণিকা

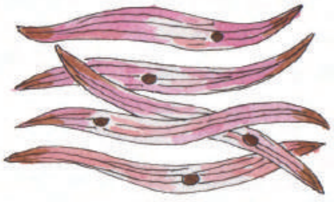
পেশিকোশ

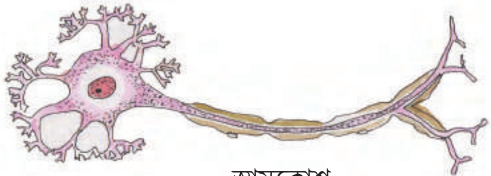
স্নায়ুকোশ

এবার নীচে মানুষের দেহের আরও নানাধরনের কোশ লক্ষ করো।

লোহিত রক্তকণিকা গোলাকার; দু -পাশ চ্যাপটা, চাকতির মতো। বিভিন্ন ব্যাসের রক্তনালীর মধ্য দিয়ে যাতায়াতের জন্য আর বেশি পরিমাণ অক্সিজেন পরিবহন করার জন্য এদের এধরনের আকার হয়।

পেশিকোশের দু -প্রান্ত ছুঁচালো, মাঝখানটা চওড়া, সংকোচন-প্রসারণের জন্য এদের আকার এরকম হয়। পেশিকোশের সংকোচন-প্রসারণের জন্য মানুষের স্থান পরিবর্তন, খাদ্যনালীর মধ্য দিয়ে খাদ্যের স্থানান্তরণ, শ্বাসনালীর মধ্য দিয়ে বায়ুর পরিবহন, রক্তনালির মধ্য দিয়ে রক্তের সংবহন ইত্যাদি কার্য সম্পন্ন হয়।

অন্যান্য কোশের তুলনায় স্নায়ুকোশ দৈর্ঘ্যে অনেক বেশি হয়। আর এর মূল কোশদেহ তারার মতো বা গোলাকার ও তার সঙ্গে নানা আকৃতির শাখা-প্রশাখা যুক্ত থাকে। এরা পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে (আলোক , শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, চাপ, ব্যথা ও তাপ ইত্যাদি) ও তাকে পরিবহন করে। এভাবে জীবদেহের বাইরের ও ভেতরের পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

যে-কোনো মেরুদণ্ডী (যেমন মাছ, ব্যাং, সাপ, পাখি, বাঘ, মানুষ) প্রাণীদের দেহে প্রায় 200-এর বেশি কোশীয় বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। উদ্ভিদদেহেও কোশের আকৃতিগত পার্থক্য চোখে পড়ে।

মূল বা কাণ্ডের অগ্রভাগে যে কোশগুলো থাকে তারা ক্রমাগত বিভাজিত হয়। এ ধরনের কোশগুলো বহুভুজাকার। আবার কাণ্ডের ভেতরে মূল থেকে পাতা পর্যন্ত জলের ঊর্ধ্বমুখী সংবহনের সঙ্গে যে কোশগুলো যুক্ত তারা আবার নলাকার।

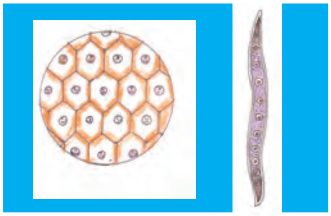

এবার কোশের আকৃতি নিয়ে নীচের সারণিটি পূরণ করো ও খাতায় প্রতিটি কোশের ছবি আঁকো। এরকম আকৃতির অন্য কোশের নাম শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্যে সারণিতে যোগ করো।

কোশের নাম	কোশের আকৃতি
(1) লোহিত রক্তকণিকা	
(2) শ্বেত রক্তকণিকা	
(3) পেশিকোশ	
(4) স্নায়ুকোশ	
(5) মূল বা কাণ্ডের অগ্রভাগের কোশ	
(6) জল পরিবহণকারী উদ্ভিদ কোশ	

টুকরো কথা

কোশের আকৃতি কী সর্বদা একরকম থাকে? কোনো ডিম্বাকার কোশ ক্যানসার কোশে রূপান্তরিত হলে গোলাকার হয়ে যায়। লোহিত রক্তকণিকা যখন বিভিন্ন ব্যাসের রক্তনালির মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে তখন তাদের আকৃতির পরিবর্তন হয়। কোশ বিভাজনের সময়েও প্রাণীকোশের আকৃতি পরিবর্তিত হয়।

করে দেখো

একটা ডিম নিয়ে সিদ্ধ করো। তারপর খোলাটা ছাড়াও। কী দেখবে? একটা সাদা অংশ ভেতরের হলুদ অংশকে ঘিরে রয়েছে। হলুদ অংশ হলো কুসুম। এটা একটা কোশের অংশ। এই একক কোশকে খালি চোখে দেখা যায়।

স্নায়ুকোশের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি। উটপাখির অনিষিক্ত ডিম হলো বৃহত্তম একক কোশ।

কতটা বড়ো একটা কোশ?

অন্য কোশরা কিন্তু মুরগির ডিমের মতো বড়ো নয়। কোশের আকার সাধারণত মাইক্রোমিটার বা মাইক্রন দিয়ে মাপা হয়। 1 মাইক্রোমিটার 1 মিটারের 10 লক্ষ ভাগের 1 ভাগ। 1 মিটার = 1000 মিলিমিটার, 1 মিলিমিটার = 1000 মাইক্রোমিটার,1 মাইক্রোমিটার(μm) = 1000 ন্যানোমিটার এবং 1 ন্যানোমিটার(nm) = 10 অ্যাংস্ট্রম (Å)। এ হিসাবে কোনো বাক্যের শেষে যে যতিচিহ্ন (Full Stop) আমরা ব্যবহার করি তাতে 1 মাইক্রন মাপের 400 টি কোশ এঁটে যায়। অধিকাংশ কোশের আকার 5-10 মাইক্রন।

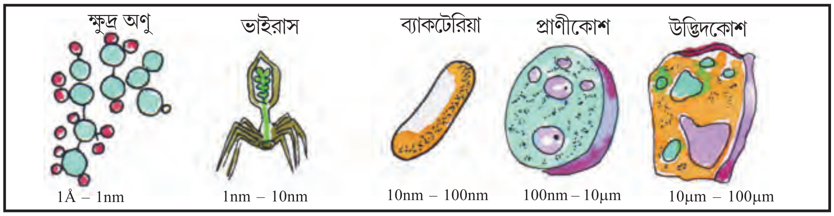

হাতির দেহের কোশ কি ইঁদুরের দেহের কোশের তুলনায় বড়ো?

কোশের আকারের (Size) সঙ্গে জীবদেহের আকারের কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। কোশের আকৃতি (Shape) বরং কোশের কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। হাতি ও ইঁদুর উভয়ের দেহেই স্নায়ুকোশ দীর্ঘ ও শাখা-প্রশাখা যুক্ত। উভয়ের দেহেই স্নায়ুকোশ উদ্দীপনা গ্রহণ ও উত্তেজনা পরিবহণের মতো কাজের সঙ্গে যুক্ত।

বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ ও কোশীয় বিশেষত্ব

প্রাণীদেহে কী কী শারীরবৃত্তীয় কাজ হয় এসো জানি—

কাজগুলির নাম	সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া
• খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক , শোষণ, আত্তীকরণ ও অপাচ্য খাদ্য বহিষ্করণ	পুষ্টি
• শ্বাসবায়ুর আদানপ্রদান ও শক্তি উৎপাদন	শ্বসন
• খাদ্যের সারাংশ ও শ্বাসবায়ুকে (O_2) দেহের দূরতম প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া	সংবহন
• দেহে উৎপন্ন ক্ষতিকারক বর্জ্যকে দেহ থেকে বার করে দেওয়া	রেচন
• এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থান পরিবর্তন করা	গমন
• পরিবেশের উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়া ও পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলা	স্নায়বিক সমন্বয়
• সংখ্যাবৃদ্ধি করা ও অস্তিত্বরক্ষা করা	জনন

উদ্ভিদদেহেও প্রাণীদেহের মতো না হলেও অন্যান্য নানা কাজ সারাদিন ধরে চলতে থাকে। যেমন—

- মাটি থেকে জল তোলা ও পাতায় পরিবহণ করা।
- অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে বের করে দেওয়া।
- ফুল, ফল ও বীজ তৈরি করা।
- সূর্যের আলো শোষণ করা ও খাদ্য তৈরি করা।
- খাদ্য সঞ্চয় ও পরিবহণ করা।
- সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।

প্রাণীদেহে নানা কাজ করতে পাকস্থলী, যকৃৎ, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, মস্তিষ্কের মতো অঙ্গ ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদদেহে একইভাবে মূল, কাণ্ড ও পাতার মতো অঙ্গ ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেকটি অঙ্গ একাধিক কলা নিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি কলা আবার একইরকম কাজ করতে পারে এরকম কোশের সমষ্টিমাত্র। অর্থাৎ জীবদেহ গঠনের ধাপগুলো হলো— (জীবদেহ → অঙ্গতন্ত্র → অঙ্গ → কলা → কোশ)।

কাজ অনুযায়ী কোশের আকার ও আকৃতি যেমন বদলে যায়, তেমনি গঠনেরও পরিবর্তন ঘটে। প্রাণীদেহে যেসব কোশ শোষণ করে তাদের আকৃতি স্তম্ভাকার। আবার যারা ক্ষরণের কাজ করে তারা ঘনকাকার। আবার মুখগহ্বরের ভেতরের যে কোশগুলি প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ করে তারা আবার মাছের আঁশের মতো দেখতে হয়। বিভিন্ন অঙ্গ যে কোশগুচ্ছ নিয়ে গঠিত হয় তারা গঠনগতভাবে এক বা আলাদা হলেও কার্যগতভাবে অভিন্ন। কোশমধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজমের বিভিন্ন আন্তঃকোশীয় বস্তুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো— অবলম্বন, শোষণ, ক্ষরণ, সংকোচনশীলতা, উত্তেজিতা, চাপ ও টান সহ্য করা ইত্যাদি। জীবনের বির্বতনের সঙ্গে সঙ্গে কোশগুলির প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে এইভাবে শ্রমবিভাজন ঘটায় কাজের পার্থক্য ঘটে। এই ঘটনা ঘটার জন্য একেক ধরনের কোশসমষ্টির উৎপত্তি হয়েছে। কোশসমষ্টিই বা কোশগুচ্ছই হলো কলা।

উদ্ভিদদেহে কোশগুচ্ছ বিভিন্ন ধরনের ভাজক কলা এবং স্থায়ী কলা গঠন করে। আর প্রাণীদেহে বিভিন্ন ধরনের কোশগুচ্ছ একত্রিত হয়ে চার ধরনের কলা গঠন করে— আবরণী কলা, যোগকলা, পেশিকলা ও স্নায়ু কলা।

জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের গঠন ও কাজ অনুযায়ী কোশের প্রোটোপ্লাজমেরও গঠনগত নানা পরিবর্তন ঘটে। ফলে অঙ্গ ও কলাভেদে কোশের কাজও বদলে যায়। নীচের ছকে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের বিভিন্ন কলার কাজগুলো বোঝানো হলো।

উদ্ভিদদেহে কোশের কাজের বিশেষত্ব ও কলার প্রকারভেদ

ভাজক কলা

• নতুন অঙ্গ সৃষ্টি করা, • মূল ও কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা, • নতুন পাতা, কাক্ষিক মুকুল ও শাখা উৎপন্ন করা, • ফুল উৎপন্ন করা, • রক্ষণমূলক আবরণ গঠন করা, • সংবহন কলা গঠন করা।

স্থায়ী কলা

• খাদ্য সংশ্লেষ, • সঞ্চয় ও পরিবহণ করা, • জল সংবহন করা, • ভারবহন ও দৃঢ়তা প্রদান করা, • বর্জ্য পদার্থ সঞ্চয় করা, • প্লবতা প্রদান করা, • ফল ও বীজের বিস্তার করা, • উদ্ভিদ অঙ্গের টান ও চাপ সহনশীলতা বৃদ্ধি করা, • ক্ষত নিরাময় করা।

প্রাণীদেহে কোশের কাজের বিশেষত্ব ও কলার প্রকারভেদ

আবরণী কলা

• দেহের বাইরে ও ভেতরের বিভিন্ন অঙ্গের মুক্ততলের ওপর প্রতিরক্ষামূলক আচ্ছাদন গঠন করা, • শোষণ করা, • ক্ষরণ করা, • অনুভূতি গ্রহণ করা, • বিজাতীয় বস্তু ও বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করা, • বহিঃকঙ্কাল (আঁশ, রোম, নখ, ক্ষুর, শিং ইত্যাদি) গঠন করা।

যোগ কলা

• ভারবহন করা, • বিভিন্ন অঙ্গ ধারণ করা, • বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা, • প্রতিরক্ষা প্রদান করা, ফ্যাট সঞ্চয় করা, • তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা।

পেশি কলা

• অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন ঘটানো, • গমনে সাহায্য করা, • খাদ্যকে গিলতে সাহায্য করা, • পৌষ্টিকনালির ও মূত্রনালির ক্রমসংকোচন ঘটানো, • হৃৎস্পন্দন ও রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা, • রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা, • শব্দ সৃষ্টি করা, • গ্রন্থির ক্ষরণ ঘটানো, • মুখের অভিব্যক্তি ঘটানো, • দৈহিক ভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানো।

স্নায়ু কলা

• সংবেদন গ্রহণ করা, • উদ্দীপনা পরিবহন করা, • দেহের বাইরের ও ভেতরের পরিবেশের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা, • পেশি সংকোচন ঘটানো, • গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করা।

প্রাণী ও উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া ও কোশীয় অঙ্গাণু

তবে আগে জানা যাক, একটা জীবকোশের গঠনে সাধারণভাবে কী কী অংশ থাকে?

সক্রিয়তামূলক কার্যাবলি

- তোমরা ঠোঁটের ভেতরের দিক বা গালের পাশের অংশ একটা পরিষ্কার টুথপিকের সাহায্যে তুলে নাও। তারপর একটা গ্লাস স্লাইডের মাঝখানে টুথপিকের মাথাটা ভালো করে ঘসে নাও।
- এবার একফোঁটা মিথিলিন ব্লু (কোশকে দেখতে সাহায্য করে এমন রঞ্জক) স্লাইডের ওপর ফেলে কভার স্লিপ দিয়ে ভালোভাবে চাপা দাও।

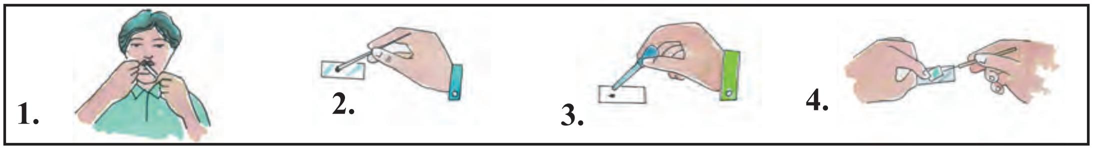

এবার মাইক্রোস্কোপের নীচে দেখলে তুমি কী দেখতে পাবে?

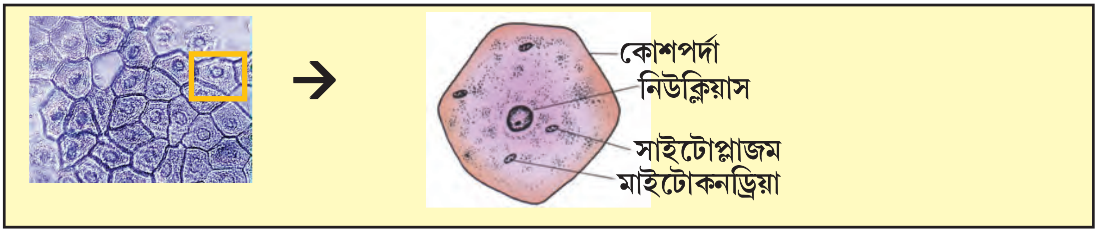

এরকম একটি প্রাণীকোশের ত্রিমাত্রিক মডেলের চিত্র নীচে দেখানো হলো।

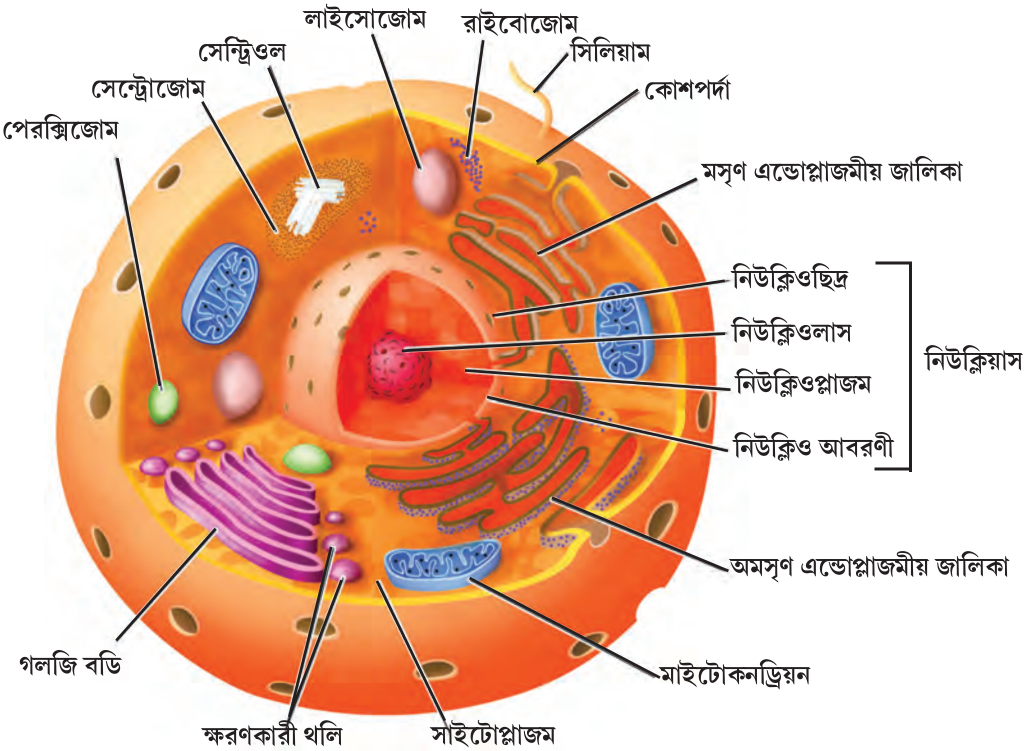

এরকম একটা প্রাণীকোশের গঠনে কী কী দেখা যায়—

• **কোশপর্দা (Cell Membrane)**— কোশের বাইরে যে পাতলা পর্দা দেখা যায় তা হলো প্লাজমা পর্দা বা কোশপর্দা। এটি কোশকে নির্দিষ্ট আকৃতি দেয়। এটি ছিদ্রযুক্ত। এই পর্দা একটি কোশকে পার্শ্ববর্তী অন্য একটি কোশ থেকে আলাদা করে রাখে। ছিদ্র থাকার জন্য কোশের ভেতরে ও বাইরের মধ্যে জল, খনিজপদার্থ ও অন্যান্য বস্তুর আদান-প্রদানে অংশগ্রহণ করে। তবে ছিদ্রের আকার ও প্রকৃতির ওপর এই দেওয়া-নেওয়া প্রক্রিয়া নির্ভর করে। তাই এটি সম্পূর্ণরূপে ভেদ্য নয়। এটি কোশের ভেতরে এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা, গলজিবস্তু, নিউক্লিয়াসের পর্দা ও অন্যান্য পর্দাঘেরা কোশীয় অঙ্গাণু গঠনেও সাহায্য করে।

• **সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)**— কোশের ভেতরকার জেলির মতো অর্ধতরল পদার্থ। বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া চালানোর জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানোর দরকার হয় তা সাইটোপ্লাজমে সম্পন্ন হয়।

• **নিউক্লিয়াস (Nucleus)**— কোশের ভেতরের ঘন গোলাকার বস্তু। এটা কোশের ভেতরে ঘটে চলা নানা প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। নিউক্লিয়াসের বাইরে নিউক্লীয় পর্দা থাকে। আর এর ভিতরে নিউক্লিওপ্লাজম নামক তরল থাকে। নিউক্লিয়াসের ভেতরে একধরনের সূক্ষ্ম জালকাকার গঠন দেখা যায় যা সুতোর মতো একে অপরকে পেঁচিয়ে থাকে। এই গঠনগুলোই হলো **DNA** । **DNA** হলো এক ধরনের বৃহৎ জৈব অণু যা নিউক্লিয়াসের মধ্যে পরিস্থিতি অনুসারে গোটানো বা আংশিক খোলা অবস্থায় থাকে ও সেটিকে সুতোর জালের মতো দেখায়। তখন একে ক্রোমাটিন জালিকা বলা হয়। গোটানো অবস্থায় কয়েক ধরনের প্রোটিনের গায়ে এটি জড়ানো থাকে। তখন **DNA** - এর এই গোটানো গঠনগুলোকে ক্রোমোজোম বলে। খোলা অবস্থায় **DNA** অণুর বিশেষ বিশেষ অংশ প্রোটিন তৈরির সংকেত বহন করে যা জীবের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। এই অংশগুলোর প্রত্যেকটিকে এক একটি জিন (Gene) বলা হয়। পিতামাতা থেকে তাদের সন্তানদের মধ্যে বংশগত বৈশিষ্ট্য এই জিনের মাধ্যমেই বাহিত হয়। নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটি ঘন গোলাকার অংশ দেখা যায় যেখানে রাইবোজোম তৈরি হয়। একে নিউক্লিওলাস (Nucleolus) বলে।

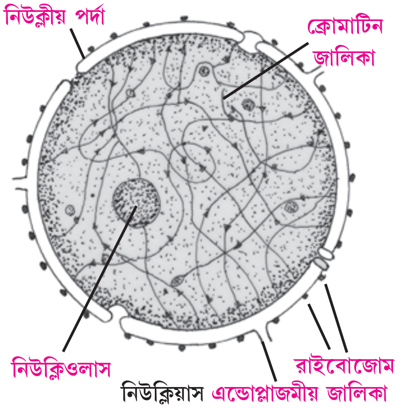

টুকরো কথা

প্রত্যেক প্রজাতিভুক্ত জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যা নির্দিষ্ট। একজন স্বাভাবিক মানুষের দেহকোশের নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোম সংখ্যা হলো 46। ক্রোমোজোম সংখ্যা বা গঠন দেখেই আমরা এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিভুক্ত জীবকে আলাদা করতে পারি।

সমস্ত কোশের নিউক্লিয়াসের গঠন কি একইরকম?

বহুকোশী জীবের নিউক্লিয়াসের মতো নিউক্লিয়াস ব্যাকটেরিয়া কোশে থাকে না (নিউক্লীয় পর্দা ও নিউক্লীয় জালিকা অনুপস্থিত)। কিন্তু পেঁয়াজের কোশ বা মুখের ভেতরের দেয়ালের কোশ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এদের নিউক্লিয়াস পর্দা দিয়ে ঘেরা। আর তার ভেতরে নিউক্লীয় জালিকা আছে।

প্রোক্যারিওটিক কোশ

ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়ার মতো পর্দাবিহীন নিউক্লীয় বস্তুযুক্ত কোশকে প্রোক্যারিওটিক (Pro : পুরোনো; Karyon : নিউক্লিয়াস) বলে। ব্যাকটেরিয়া ও সায়ানোব্যাকটেরিয়া ছাড়া অন্য অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণীকোশের নিউক্লিয়াসে পর্দা ও নিউক্লীয় জালিকা দেখা যায়। এরা হলো ইউক্যারিওটস (Eu: প্রকৃত; Karyon: নিউক্লিয়াস)।

ইউক্যারিওটিক কোশ

কোশের অভ্যন্তরে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমকে একত্রে প্রোটোপ্লাজম বলে।

- অন্যান্য কোশীয় অঙ্গাণু (Other Cell Organelles)— কোশের সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন ধরনের সূক্ষ্ম গঠনকে অঙ্গাণু বলা হয়। এরা একত্রেও নানা ধরনের শারীরবৃত্তীয় কাজে (খাদ্যবস্তুর পরিপাক, ভাঙন ও শক্তি উৎপাদন, প্রোটিন সংশ্লেষ, পরিবহণ, সঞ্চয় ও ক্ষরণ; কোশবিভাজন; খাদ্য ও বর্জ্য পদার্থ সঞ্চয়; প্রতিরক্ষা প্রদান) অংশগ্রহণ করে।

নীচে বিভিন্ন অঙ্গাণুর মডেলের ছবি দেখানো হয়েছে।

মাইটোকনড্রিয়ন

- মাইটোকনড্রিয়া (Mitochondria) (একবচনে মাইটোকনড্রিয়ন)— গোলাকার, ডিম্বাকার বা রডের মতো দেখতে। এর ধাত্রের মধ্যে নানা ধরনের উৎসেচক, রাইবোজোম ও নিউক্লিক অ্যাসিড (**DNA** ও **RNA**) থাকে। এরা খাদ্যের পরিপোষককে (গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড) ভেঙে শক্তি উৎপন্ন করে। এরা দুটি প্লাজমা পর্দা দিয়ে ঘেরা কোশীয় অঙ্গাণু। অন্তঃপর্দা ভাঁজ হয়ে ক্রিস্টি গঠন করে। মাইটোকনড্রিয়া শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।

অমসৃণ ও মসৃণ এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা

- এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা (Endoplasmic Reticulum)— এরা প্লাজমা পর্দা থেকে উৎপন্ন হয়ে নিউক্লীয় পর্দা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। কতকগুলো পর্দাবেষ্টিত নানা আকারের নল নিয়ে এরা গঠিত। এরা সাইটোপ্লাজমকে কতকগুলো অসম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠে ভাগ করে। কোনো কোনো পর্দার বাইরের দিকে প্রোটিন সংশ্লেষকারী রাইবোজোম যুক্ত থাকে। তাই এদের অমসৃণ দেখায়। আর কোনো পর্দার বাইরের দিকে রাইবোজোম না থাকায় মসৃণ হয়। বিভিন্ন কোশীয় বস্তুর (প্রোটিন ও লিপিড) সংশ্লেষ, পরিবহণ ও সঞ্চয়ে এই অঙ্গাণু অংশগ্রহণ করে।

গলজি বস্তু

- গলজি বস্তু (Golgi bodies)— নিউক্লিয়াসের কাছে থাকা চ্যাপ্টা থলি, লম্বা থলি বা ছোটো গহ্বরের মতো গঠনযুক্ত অঙ্গাণু। এরা পরস্পর সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত থাকে। কোশমধ্যস্থ বিভিন্ন বস্তুর (হরমোন ও উৎসেচক) পরিবহণ ও ক্ষরণে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা থেকে গলজি বস্তুর সৃষ্টি হয়।

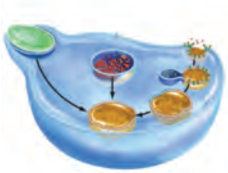
লাইসোজোম

- লাইসোজোম (Lysosome)—গলজি বস্তু থেকে উৎপন্ন পর্দা দিয়ে ঘেরা থলির মতো অঙ্গাণু বিশেষ। এর মধ্যে খাদ্যকে হজম করার, জীবাণুদের মেরে ফেলার ও পুরোনো জীর্ণ কোশকে ধ্বংস করার জন্য নানা ধরনের উৎসেচক থাকে। কোশের মধ্যে এটি নানা রূপে অবস্থান করে (লাইসোজোমের বহুরূপতা)। লাইসোজোম যে কোশে থাকে সেই কোশকেই ধ্বংস করতে পারে বলে একে আত্মঘাতী থলি বলে। এই অঙ্গাণুর সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে ক্যানসার হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

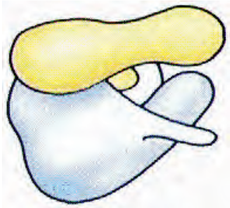
রাইবোজোম

- রাইবোজোম (Ribosome)---এরা পর্দাবিহীন। সাধারণত কোশের সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও, অন্য কয়েকটি অঙ্গাণুর ভেতরে (মাইটোকনড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাসটিড) কিংবা এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা ও নিউক্লীয় পর্দার বাইরের দিকেও এই অঙ্গাণুকে আবদ্ধ অবস্থায় দেখা যায়। প্রোটিন সংশ্লেষ করা এই অঙ্গাণুর প্রধান কাজ। সংশ্লেষিত প্রোটিন কোশের ক্ষয়পূরণে ও নতুন কোশ তৈরিতে অংশগ্রহণ করে। কোনো কোনো প্রোটিন কোশের বাইরেও ক্ষরিত হয়।

- সেন্ট্রোজোম (Centrosome)---এরাও পর্দাবিহীন। প্রাণীকোশের বিভাজনে এই অঙ্গাণু অংশগ্রহণ করে।

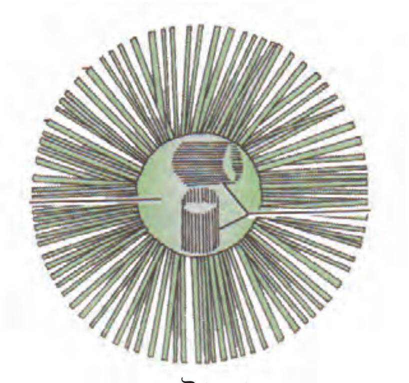

সেন্ট্রোজোম

উদ্ভিদ কোশ

সক্রিয়তামূলক কার্যাবলি

এবার একটি পেঁয়াজ নাও। পেঁয়াজের শুকনো, বাদামি খোসা ছাড়িয়ে ফেলো। ভেতরের যে-কোনো একটি সাদা শাঁসালো স্তর সংগ্রহ করো। এর থেকে একটি পাতলা স্তরকে আলাদা করো। এবার এর প্রস্থচ্ছেদ করো। প্রস্থচ্ছেদে যে অংশটি পাওয়া গেল তাকে স্লাইডে রেখে তার মধ্যে কয়েকফোঁটা মিথিলিন ব্লু যোগ করো। এবার কভার স্লিপ দিয়ে চাপা দিয়ে মাইক্রোস্কোপের নীচে লক্ষ করো।

পেঁয়াজের শল্কপত্রের কোশ

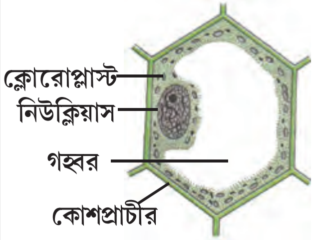

বিবর্ধিত উদ্ভিদকোশ

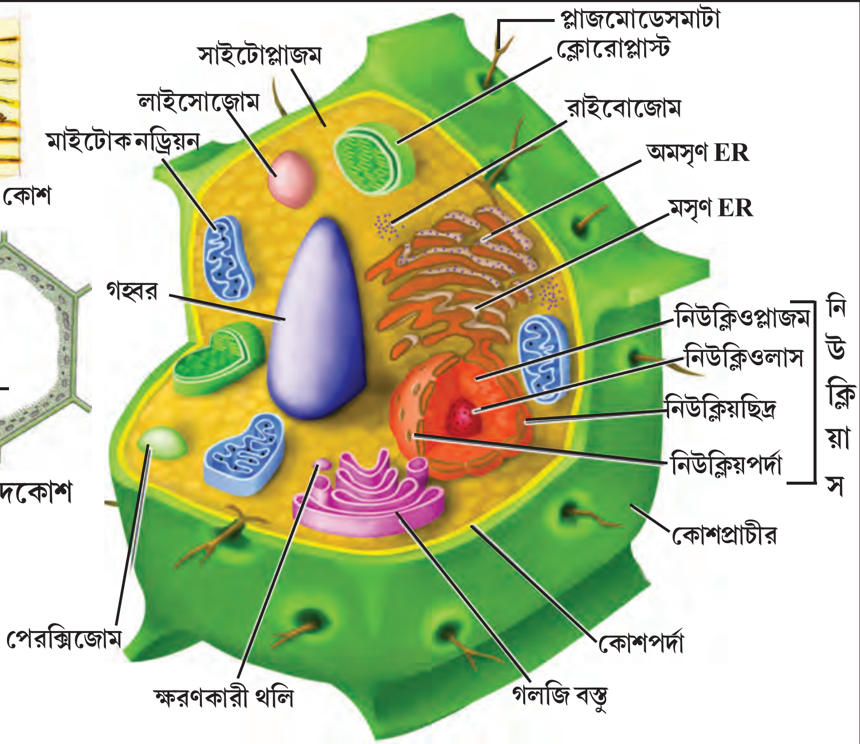

একটি উদ্ভিদকোশের ত্রিমাত্রিক মডেলের চিত্র

দেখোতো, কোন কোন অঙ্গাণু প্রাণীকোশে আছে আবার উদ্ভিদ কোশেও আছে। সেগুলো নীচের ছকে লেখো। আবার কোন কোন অঙ্গাণু প্রাণীকোশে নেই অথচ উদ্ভিদকোশে আছে তার নামও ওই ছকে লেখো।

প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয় কোশে আছে	প্রাণীকোশে নেই অথচ উদ্ভিদকোশে আছে

পেঁয়াজের কোশে প্লাজমা পর্দার বাইরে একটি অতিরিক্ত পুরু স্তর দেখা যায়। এই স্তরটি হলো কোশপ্রাচীর (Cell Wall)। প্রাণীকোশে এটি দেখা যায় না।

কোশপ্রাচীর ও কিছু কথা

উদ্ভিদকোশের বাইরে যে বিস্তৃত বহিঃকোশীয় ধাত্র থাকে তাই হলো কোশপ্রাচীর। এটি মৃত, পুরু, শক্ত এবং দৃঢ়। পরিবেশে প্রায়ই তাপমাত্রার পার্থক্য হয়। বায়ু প্রবাহের গতি বাড়ে বা কমে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণেরও হেরফের হয়। স্থান পরিবর্তন না করতে পারার জন্য সবসময়েই উদ্ভিদকে এধরনের পরিবেশের প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। উদ্ভিদকোশের তাই অতিরিক্ত সুরক্ষার প্রয়োজন হয়। কোশপ্রাচীর উদ্ভিদকে এই অতিরিক্ত সুরক্ষা দিয়ে থাকে।

কোশপ্রাচীরে ছিদ্রের সংখ্যা নির্দিষ্ট। পরিবেশ ও উদ্ভিদকোশের মধ্যে বৃহৎ অণুর আদান-প্রদানও সীমিত। কোশপ্রাচীরের যান্ত্রিক দৃঢ়তার জন্য বাইরে লঘুসারক (হাইপোটনিক) দ্রবণ থাকলেও উদ্ভিদকোশ সহজেই বেঁচে থাকতে পারে। এই কোশপ্রাচীরের রাসায়নিক গঠনের পার্থক্যের জন্য উদ্ভিদের কোনো অঙ্গ নরম, মাঝারি শক্ত বা খুব শক্ত ও দৃঢ় হয়।

কোশপ্রাচীরের উপস্থিতির জন্যই উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের মধ্যে আন্তঃকোশীয় সংযোগ, বৃদ্ধি, জলসাম্য বজায় রাখা, পুষ্টি, বংশবিস্তার, প্রতিরক্ষা ও বাহ্যিক গঠনের নানা পার্থক্য চোখে পড়ে।

তুমি যখন মাইক্রোস্কোপের নীচে পেঁয়াজের কোশ লক্ষ করছিলে তখন কি কোনো ফাঁকা গঠন তোমার চোখে পড়েছে?

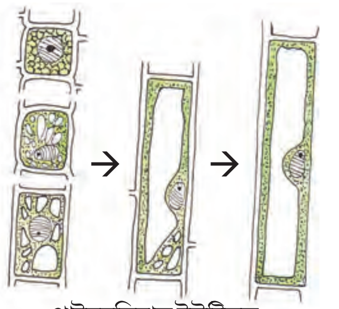
প্রাইমরডিয়াল ইউট্রিকল

যদি এমন গঠন তোমার চোখে পড়ে, তবে জানবে এরা হলো গহ্বর (Vacuole)। পেঁয়াজের কোশে এরা সংখ্যায় একটি আর আকৃতিতেও বড়ো। কিন্তু মুখগহ্বরের কোশে এরা সংখ্যায় অনেক আর আকৃতিতে ছোটো। সাধারণত উদ্ভিদকোশে বৃহদাকৃতির গহ্বর আর প্রাণীকোশে ছোটো আকারের গহ্বর দেখা যায়। উদ্ভিদকোশে গহ্বরের বাইরে কোনো পর্দা থাকে না। গহ্বরের আকার ক্রমশ যখন বাড়তে থাকে, তখন নিউক্লিয়াসসহ সাইটোপ্লাজম কোশপ্রাচীরের ভেতরের দিকে কোশের পরিধির দিকে সরে যায়। গহ্বরকে বেষ্টন করে সাইটোপ্লাজমের এরকম বিন্যাসকে প্রাইমরডিয়াল ইউট্রিকল বলে। উদ্ভিদকোশের গহ্বরে জল, অক্সিজেন, রেচন পদার্থ ইত্যাদি জমা থাকে।

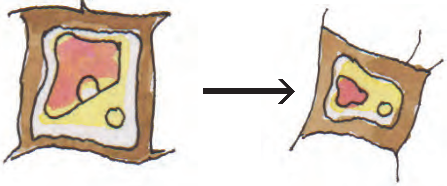

উদ্ভিদকোশ সাইটোপ্লাজমের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হলেও কুঁচকে যায় না। উদ্ভিদদেহ গঠনে গহ্বর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোশের আকার (Size) বাড়বে না কমবে তা কোশের মধ্যে জলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। উদ্ভিদ মাটি থেকে কত পরিমাণ জল শোষণ করতে পারে তার উপর নির্ভর করে গহ্বর জল গ্রহণ করবে না ছাড়বে। প্রখর সূর্যালোকে দীর্ঘ সময় কোনো গাছের চারাকে রাখলে পাতাগুলো নুইয়ে পড়ে। আবার জলের উৎসের সংস্পর্শে এলে গাছটি আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে। কারণটি তোমরা বোঝার চেষ্টা করো।

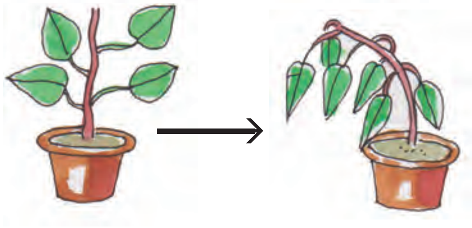

উদ্ভিদ ও প্রাণীকোশে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে আর কি কোনো পার্থক্য তোমার চোখে পড়েছে?

পাতাশেওলা, ঝাঁঝির কোশ নিয়ে তুমি যদি রং করে দেখো তবে দেখতে পাবে সাইটোপ্লাজমে এক ধরনের রঙিন গঠন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এরা হলো প্লাসটিড (Plastids)। রং করার পর এরা নানা রং-এর হয়ে থাকে। এদের কারো মধ্যে সবুজ রং-এর রঞ্জক ক্লোরোফিল থাকে। এরা হলো ক্লোরোপ্লাসটিড। ক্লোরোপ্লাস্টিড - এর মধ্যে গ্রানা নামক এক বিশেষ গঠন দেখা যায়। এদের উপস্থিতির জন্য উদ্ভিদের নানা অঙ্গ সবুজ হয়। ক্লোরোপ্লাস্টের ধাত্রেও নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA ও RNA) থাকে। উদ্ভিদদেহের কোথায় কোথায় ক্লোরোপ্লাস্ট দেখা যায় তার একটি তালিকা তৈরি করো।

(1) .... (2) .... (3) .... (4) ....

উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে। ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে থাকা ক্লোরোফিল এই প্রক্রিয়ায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। ক্লোরোপ্লাসটিড ছাড়া আরও দু-ধরনের প্লাসটিড উদ্ভিদকোশে দেখা যায়। দ্বিতীয় ধরনের প্লাসটিডে কমলা, লাল, হলুদ ও অন্যান্য বর্ণের (সবুজ ব্যতীত) রঞ্জক থাকে। এরা ফুল ও ফলের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে। এদের ক্রোমোপ্লাসটিড বলা হয়। আর তৃতীয় ধরনের প্লাসটিড বর্ণহীন। নানাধরনের খাদ্য সঞ্চয় করে। এদের লিউকোপ্লাসটিড বলা হয়।

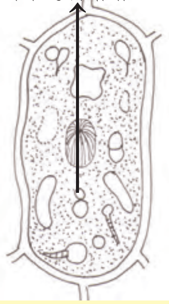

উদ্ভিদ ও প্রাণীকোশ কি একইরকম না আলাদা?

তুমি যদি পেঁয়াজ কোশ ও মুখের ভেতরের দেয়ালের কোশ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকো, তবে তাদের ছবিগুলো খাতায় এঁকে আবার লক্ষ করো ও বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত করো।

পেঁয়াজের কোশ	মুখের ভেতরের দেয়ালের কোশ

বৈশিষ্ট্য	উদ্ভিদকোশ	প্রাণীকোশ
(1) কোশপ্রাচীর		
(2) গহ্বর		
(3) প্লাসটিড		
(4) সেন্ট্রোজোম		

এবার এসো উদ্ভিদ ও প্রাণীকোশের গঠনগত বিভিন্ন অংশকে একসঙ্গে আরেকবার জেনে ও বুঝে নিই।

অঙ্গাণুর নাম	অবস্থান (উদ্ভিদকোশ/প্রাণীকোশ)	বৈশিষ্ট্য	কাজ
(1) কোশপ্রাচীর			
(2) প্লাজমা পর্দা			
(3) সাইটোপ্লাজম			
(4) নিউক্লিয়াস			
(5) মাইটোকনড্রিয়া			
(6) গলজি বস্তু			
(7) লাইসোজোম			
(8) সেন্ট্রোজোম			
(9) রাইবোজোম			
(10) প্লাসটিড			
(11) গহ্বর			

- দেখোতো, নীচের ছকে দু-পাশের কথাগুলো দাগ টেনে মেলাতে পারো কিনা। ডানদিকে একটি বাড়তি নাম দেওয়া আছে।

A স্তম্ভ	B স্তম্ভ
(ক) যে অঙ্গাণু কোশের শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়	(i) লাইসোজোম
(খ) প্রাণীকোশ বিভাজনে যে অঙ্গাণু অংশগ্রহণ করে ।	(ii) ভ্যাকুওল
(গ) উদ্ভিদকোশে যে অংশ থাকার জন্য গাছের গুঁড়ি ভীষণ শক্ত হয়।	(iii) গলজিবডি
(ঘ) কোশের যে অংশটির মধ্যে জিন থাকে।	(iv) নিউক্লিয়াস
(ঙ) চ্যাপটা থলি লম্বা থলি আর ছোটো গহ্বরের ভাঁড়ার।	(v) প্লাসটিড
(চ) রোগজীবাণু পাচন করে ধ্বংস করার সময়ে শ্বেতরক্তকণিকায় যে অঙ্গাণুর সংখ্যা বাড়ে।	(vi) মাইটোকনড্রিয়া
	(vii) রাইবোজোম

A স্তম্ভ	B স্তম্ভ
(ছ) উদ্ভিদকোশে এখানে জল, খাদ্য, রেচনদ্রব্য, বায়ু এসব জমানো থাকে।	(viii) কোশপ্রাচীর
(জ) সাইটোপ্লাজমকে কতকগুলি অসম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে।	(ix) সেন্ট্রোজোম
(ঝ) খাদ্য তৈরি করে, খাদ্য সঞ্চয় করে, আবার ফুল-ফলের রং-ও নির্ধারণ করে।	(x) এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা
(ঞ) প্রোটিন সংশ্লেষকারী কোশে এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকার বাইরের দেয়ালে যা লেগে থাকার জন্য অমসৃণ লাগে।	(xi) কোশপর্দা

- নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও (একের বেশি উত্তর ঠিক হতে পারে)।

(i) প্রোটিন তৈরি করতে সাহায্য করে :

(i) লাইসোজোম (ii) রাইবোজোম (iii) নিউক্লিওলাস (iv) গলজি বস্তু (v) সাইটোপ্লাজম (vi) এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা (vii) ক্ষরণ দানা (viii) ভ্যাকুওল (টিক দাও)

(ii) কোশের নানা উপাদান সংশ্লেষ, সঞ্চয় আর ক্ষরণ করতে সাহায্য করে।

(i) এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা (ii) গলজি বস্তু (iii) লাইসোজোম (iv) সেন্ট্রোজোম (v) ভ্যাকুওল (টিক দাও)

- কোন কোন অঙ্গাণু একটি অপরটির বিপরীত কাজ করে খুঁজে বার করে লেখো।

(i) উদ্ভিদকোশে খাদ্য সংশ্লেষ ও ভাঙন

(ii) প্রাণীকোশে কোশের ভেতরে প্রোটিন সংশ্লেষ ও প্রোটিন পাচন

- কোশের কোন অঙ্গাণু থেকে কোন অঙ্গাণুটি উৎপন্ন হয় লেখো।

(i) গলজি বস্তু : মাইটোকনড্রিয়া/কোশপর্দা/ এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা

(ii) লাইসোজোম :সেন্ট্রোজোম/ গলজি বস্তু/ এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা

(iii) এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা : কোশপর্দা/প্লাসটিড/ গলজি বস্তু

(iv) রাইবোজোম : নিউক্লিওলাস/ সেন্ট্রোজোম/ লাইসোজোম

- নখ ও চুলের প্রান্তদেশের কোশগুলি বারবার বিভাজিত হয়ে নখ আর চুলের বৃদ্ধি ঘটায়। এই কোশগুলিতে কোন অঙ্গাণুটি খুব সক্রিয় থাকে?
- শ্বেতরক্তকণিকাগুলি নিজের কোশের মধ্যে রোগজীবাণুদের পাচন করে ধ্বংস করে। ওই সময়ে কোন অঙ্গাণুটির সংখ্যা বেড়ে যায় ও কেন?

- খাওয়ার পরেপরেই পাকস্থলীর উৎসেচক ক্ষরণকারী গ্রন্থিকোশগুলিতে কোন অঙ্গাণুটির সংখ্যা খুব বেড়ে যায়?
- অন্ত্রের দেয়ালের পেশিকোশগুলি আস্তে আস্তে নড়াচড়া করে। কিন্তু হাত-পায়ের পেশিকোশগুলি নড়াচড়া করে খুব তাড়াতাড়ি। তাহলে হাত-পায়ের পেশির কোশে কোন অঙ্গাণুটি অনেক সংখ্যায় আছে?
- যেমন করে পেঁয়াজের শল্কপত্রের কোশ দেখেছিলে, তেমনি করে স্লাইডের ওপর রেখে পর্যবেক্ষণ করো এবং কীরকম কোন কোশ পেলে লেখো ঃ

    (i) পুঁই বা লাউডাঁটার ছাল

    (ii) পুঁই অথবা লিলিপাতার ছাল

    (iii) ভাঙা ডিমের ভাসতে থাকা পর্দার মতো অংশ (মুরগির ভ্রূণ)

    (iv) মাংসের গায়ে লেগে থাকা সাদা পর্দার মতো অংশ

বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও কোশের ওপর প্রভাব

জীবজগৎ নানাধরনের পরিবেশে বাস করে। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান (বায়ুর উষ্ণতা, আর্দ্রতা, অক্সিজেনের পরিমাণ, সালফারের পরিমাণ, চাপ) -এর সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য জীবদেহে গঠনগত ও কার্যগত নানা বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। আর এই গঠনগত ও কার্যগত নানা বৈচিত্র্যের প্রকাশ কোশীয় পরিবেশেও চোখে পড়ে। এবার দেখা যাক জীবরা কত বিভিন্ন ধরনের পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে।

(1) খুব শুকনো ও অত্যন্ত গরম পরিবেশ (মরু অঞ্চল)

(2) খুব শুকনো ও অত্যন্ত ঠান্ডা পরিবেশ (মেরু অঞ্চল)

(3) জলজ পরিবেশ (পুকুর, হ্রদ, নদী, খাল, বিল ইত্যাদি)

(4) লবণাক্ত পরিবেশে (সমুদ্র, খাঁড়ি, মোহনা)

(5) কম অক্সিজেনযুক্ত পরিবেশ

(6) অধিক সালফার যুক্ত পরিবেশ

(7) পচনশীল জৈব পদার্থযুক্ত পরিবেশ

(8) বায়বীয় পরিবেশ

(9) উচ্চ চাপযুক্ত পরিবেশ (সমুদ্রের গভীর অঞ্চলে)

(10) অধিক উচ্চতাযুক্ত পরিবেশ (15000 ফুটের অধিক উচ্চতায়)

বিভিন্ন পরিবেশ ও জীবের নানান সমস্যা :

এসো দেখি ওই পরিবেশে বাস করা জীবরা কী করে নিজেরাই এই সমস্যা সমাধান করেছে?

- খুব শুকনো ও গরম পরিবেশে ক্যাকটাস জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায়। এদের কাণ্ডের কোশে জল

সঞ্চয়ী উপাদান মিউসিলেজের আধিক্য চোখে পড়ে। আর কোশের বাইরে মোমজাতীয় পদার্থের আস্তরণ দেখা যায় যা বাষ্পমোচনের হার কমায়।

ক্যাকটাস

- খুব শুকনো ও ঠান্ডা পরিবেশে বসবাসকারী প্রাণীদের কোশে অ্যান্টিফ্রিজ প্রোটিন থাকে যা কোশীয় তরলে বরফের কেলাস তৈরিতে বাধা দেয়। এছাড়াও তাপ সংরক্ষণের প্রয়োজনে এদের দেহে ফ্যাট সঞ্চয়কারী কোশের প্রাচুর্য থাকে।
- মিষ্টিজলে বসবাসকারী উদ্ভিদের পুষ্প ও পত্রবৃন্তে বায়ুগহ্বরযুক্ত প্যারেনকাইমা কোশ থাকে। এধরনের কোশ থাকার জন্য এরা সহজেই জলে ভেসে থাকতে পারে।
- লবণাক্ত পরিবেশে বসবাসকারী উদ্ভিদের মূলে লবণপূর্ণ কোশ থাকে। প্রাণীদের ফুলকায় ক্লোরাইড কোশ থাকে যা অতিরিক্ত Na^+ ও Cl^- দেহ থেকে বার করে দিতে পারে।

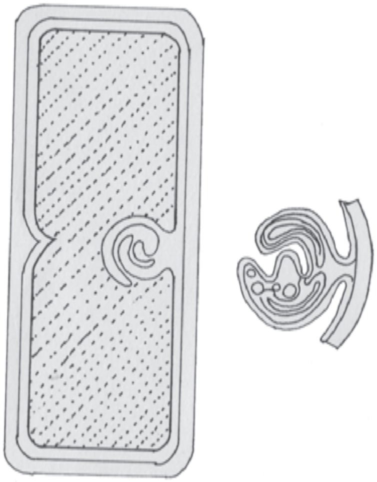

মেসোজোম

- কম অক্সিজেনযুক্ত পরিবেশে বিকল্প শ্বসন চালানোর জন্য ব্যাকটেরিয়ার কোশে মাইটোকনড্রিয়া অনুপস্থিত। পরিবর্তে কোশপর্দা ভিতরে সাইটোপ্লাজমের দিকে ভাঁজ হয়ে থলির মতো মেসোজোম গঠন করে। মেসোজোম শ্বসনে অংশগ্রহণ করে।
- উষ্ণ ও অধিক সালফার বা সালফার যৌগযুক্ত পরিবেশে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন বিজারণ বিক্রিয়ার সাহায্যে শক্তি সংগ্রহ করে।
- পচনশীল জৈবপদার্থ যুক্ত পরিবেশে বসবাসকারী জীবদেহের কোশে অধিক অম্লত্ব সহ্য করার ক্ষমতা বর্তমান।
- বায়বীয় পরিবেশে উড়তে ও ভেসে থাকতে সক্ষম প্রাণীদের লোহিতরক্তকণিকায় অতিরিক্ত অক্সিজেন পরিবহণের প্রয়োজনে অধিক মাত্রায় হিমোগ্লোবিন থাকে। খাদ্য ভেঙে দ্রুত শক্তি পাওয়ার প্রয়োজনে কোশে মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যার আধিক্যও চোখে পড়ে। পতঙ্গের দ্রুত ডানা ঝাপটানোর প্রয়োজনে ডানা সংলগ্ন পেশিকোশের এত সংখ্যক মাইটোকনড্রিয়া থাকে যে তারা একত্রিত হয়ে প্রায় কেলাসাকার গঠন সৃষ্টি করে।
- সমুদ্রের গভীরে উচ্চচাপযুক্ত পরিবেশে যে সকল প্রাণী বসবাস করে তাদের কোশেও মাইটোকনড্রিয়া সংখ্যায় বেশি থাকে। অন্তঃকঙ্কালের কোশে ক্যালশিয়ামের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে।
- অধিক উচ্চতা যুক্ত পরিবেশে বসবাসের জন্য প্রাণীদের রক্তে লোহিতরক্তকণিকার সংখ্যা বেড়ে যায়। পেশিকোশে মাইটোকনড্রিয়া ও মায়োগ্লোবিনের (অক্সিজেন সরবরাহকারী শ্বাসরঞ্জক) সংখ্যা ও পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেড়ে যায়। লোহিতরক্তকণিকার সংখ্যা বাড়ায় তাতে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণও বেড়ে যায়।

7 অণুজীবের জগৎ

অণুজীবের বৈচিত্র্য

ওপরে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ছবি লক্ষ করো। এরা পরিবেশের সজীব উপাদান। বায়ু, জল, মাটি অথবা অন্য নানা জায়গায় এদের দেখা যায়। কিন্তু আমরা কী জানি আমাদের চারদিকে এরা ছাড়াও আরও নানা ধরনের জীব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এদের খালি চোখে দেখা যায় না। এরা হলো অণুজীব। আমরা এই অদৃশ্য অণুজীবদের সম্পর্কে এসো জানার চেষ্টা করি।

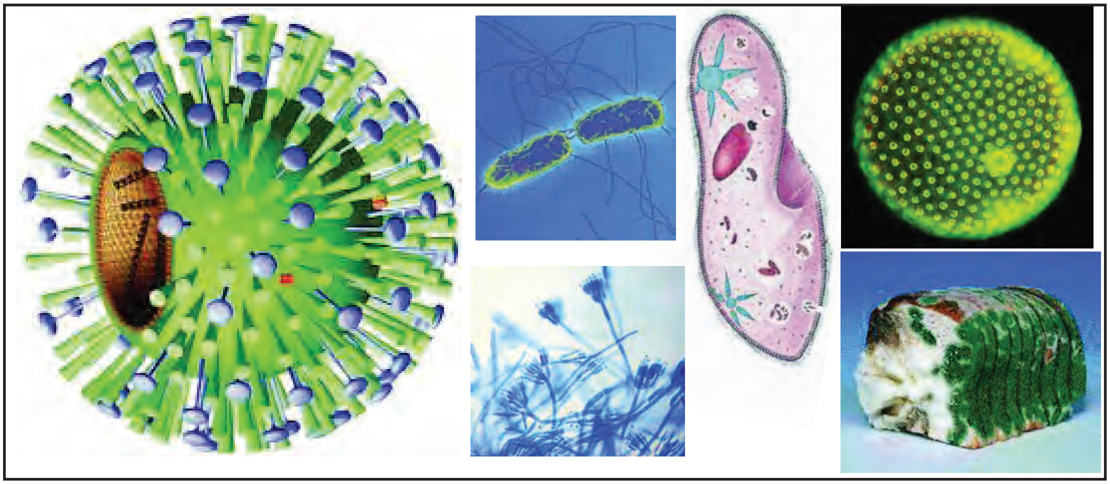

তোমার কাজ

বর্ষাকালে পাঁউরুটি ভিজে গেলে বা জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে দীর্ঘক্ষণ থাকলে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। এর ওপরে ধূসর সাদা রঙের স্তর তৈরি হয়। একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস (Magnifying glass) জোগাড় করে তা দিয়ে পাঁউরুটির ওপর ছাপছাপ জায়গাগুলো দেখার চেষ্টা করো। তুমি কতকগুলো খুব ছোটো, সূক্ষ্ম কালো রঙের গোল গোল কিছু দেখতে পাবে। এই ধরনের গঠন কী এবং এরা কোথা থেকে আসে?

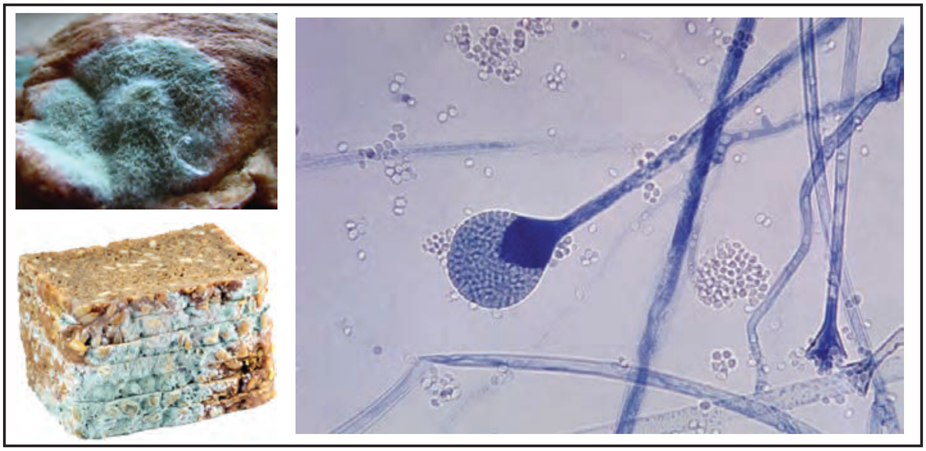

তুমি আর কোথায় কোথায় অণুজীব দেখতে পারো

(a) নীচের নমুনাগুলো সংগ্রহ করে প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা ভাবে রাখো। কাছাকাছি কোনো আবদ্ধ জলাশয় বা পুকুর থেকে একটা গ্লাসে কিছুটা জল নাও। একটুকরো কাপড়ের মধ্য দিয়ে জলটাকে যেতে দাও। তারপর ছাঁকা পুকুরের জলকে রেখে দাও।

(b) একটা পাতা সংগ্রহ করো। এর ওপরের তলটা জল দিয়ে ভালো করে ধোও এবং ধোওয়া জলটা সংগ্রহ করো।

(c) তোমার নোংরা হাত জল দিয়ে ধোও এবং ধোওয়ার সময় সেই জল একটা পাত্রে সংগ্রহ করো।

(d) এক-দু-ফোঁটা দই নিয়ে তাতে একটু জল মেশাও।

(e) তোমার আশপাশের জমি থেকে কিছুটা ভেজা মাটি সংগ্রহ করো। মাটির নমুনাকে বিকারে রেখে জল মেশাতে থাকো। মাটির কণা তলায় থিতিয়ে পড়লে ওপরের জল সংগ্রহ করো।

যখন তুমি ওপরের যে-কোনো নমুনা লক্ষ করবে, দেখবে সবগুলোই প্রায় স্বচ্ছ। কিন্তু গ্লাস স্লাইডে যে-কোনো নমুনার এক-দু-ফোঁটা নিয়ে মাইক্রোস্কোপের নীচে দেখলে দেখবে কত ছোটো ছোটো জীব তাতে ভেসে আছে। কিলবিল করছে বা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। এর থেকে কী কী সিদ্ধান্তে তুমি আসতে পারো?

1.

2.

অণুজীবদের কথা

পৃথিবীতে আজ অবধি যতরকম জীবের অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে তার মধ্যে সব থেকে পুরোনো হলো এই অণুজীবরা। প্রায় 350 কোটি (3.5 বিলিয়ন) বছর ধরে এরা পৃথিবীতে টিঁকে আছে। কিন্তু তার পরে আসা বহু জীব পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অণুজীবদের সবার ওজন যদি যোগ করা যায়, তবে দেখা যাবে খালিচোখে দেখতে না পাওয়া এই অণুজীবদের ভর পৃথিবীর সমস্ত জীব-ভরের প্রায় 60%। আমরা প্রশ্বাসের সময় যে পরিমাণ (O_2) গ্রহণ করি তার অর্ধেক পরিমাণই তৈরি করে বিশেষ কিছু অণুজীব। তোমার পায়ের নীচে যে মাটি আছে তাতে প্রায় বহু ধরনের অণুজীব বসবাস করে। আর এক গ্রাম মাটিতে প্রায় 100 কোটি অণুজীব থাকে।

অণুজীবদের বৈশিষ্ট্য :

1. পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এদের পাওয়া যায়— গরম মরুভূমি, মেরু অঞ্চলের বরফের স্তূপে, নোনা জলে, জলাভূমিতে, উষ্ণ প্রস্রবণে, এমনকী অন্য জীবদেহের ভেতরেও (মানুষের খাদ্যনালিতে, উইপোকার খাদ্যনালিতে)। কোথায় কোথায় অণুজীব থাকতে পারে তা আলোচনা করে লেখো।

2. অধিকাংশ অণুজীবদের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় আবার ইস্ট কিংবা টিটেনাস রোগসৃষ্টিকারী অণুজীবরা কম অক্সিজেন ঘনত্বেও বেঁচে থাকতে পারে। পরিবেশের কোন কোন স্থানে অক্সিজেনের ঘনত্ব বেশি বা কম থাকে তা আলোচনা করে লেখো।

3. এদের বেঁচে থাকার জন্য ভেজা জায়গা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

4. অন্ধকারময় জায়গায় এরা তাড়াতাড়ি বাড়ে। সরাসরি সূর্যের আলোর সংস্পর্শে এলে কোনো কোনো অণুজীব মারা যায়।

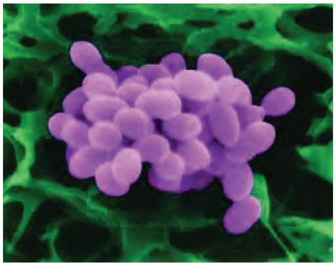

5. এদের কেউ কেউ পচা-গলা বস্তু থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। আবার অন্যরা অন্য কোনো জীবদেহে বাসা বাঁধে ও ওই জীবদেহের নানা অঙ্গ, তরল বা কলাকোশ থেকে বেঁচে থাকার খাদ্য সংগ্রহ করে। আবার কেউ কেউ নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারে।

(i) অন্য কোনো জীবদেহে বাসা বাঁধে বা অন্য কোনো জীবদেহ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। এমন ধরনের অণুজীব হলো ভাইরাস, কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া (মোনেরা), ছত্রাক ও কোনো কোনো আদ্যপ্রাণী (প্রোটিস্টা)।

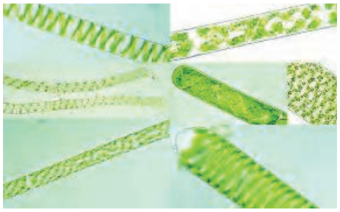

(ii) অ্যালগি ও কয়েক ধরনের অণুজীব নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করতে পারে।

6. সাধারণত বেশিরভাগ অণুজীব 25^0C থেকে 38^0C তাপমাত্রার মধ্যে তাড়াতাড়ি বাড়ে ও বেঁচে থাকে। তবে কোনো কোনো অণুজীব -10^0C এর নীচে বা 100^0C তাপমাত্রার ওপরেও বেঁচে থাকতে পারে। বিশেষ কিছু থার্মোফিলিক ব্যাকটেরিয়া 100^0C তাপমাত্রার কাছাকাছি বংশবৃদ্ধি করে। নানান উষ্ণ প্রস্রবণের জলে বা গভীর সমুদ্রের গরম জল বেরোবার উৎসের (hydrothermal vent) কাছাকাছি থার্মোফিলিক ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায়।

7. অনেকক্ষেত্রে অণুজীবদের অণুবীক্ষণের মধ্যে দিয়ে দেখার সময় বিশেষ বিশেষ রঙের সাহায্যে রাঙিয়ে নিতে হয়। এই রঙগুলোকে বলে স্টেইন (Stain) এবং রাঙিয়ে নেবার পদ্ধতিকে বলে স্টেইনিং (Staining)।

অণুজীবরা কত ধরনের

অণুজীবরা প্রধানত চার ধরনের। এরা হলো —

- ব্যাকটেরিয়া (মোনেরা)
- আদ্যপ্রাণী (প্রোটিস্টা)
- ছত্রাক (ফাংগি)
- শৈবাল (প্লান্টি)

এছাড়া ভাইরাসরাও আণুবীক্ষণিক। আর এরাও নানারকম ভূমিকা (উপকারী বা অপকারী) পালন করে।

(A) ব্যাকটেরিয়া (মোনেরা)

(B) আদ্যপ্রাণী (প্রোটিস্টা)

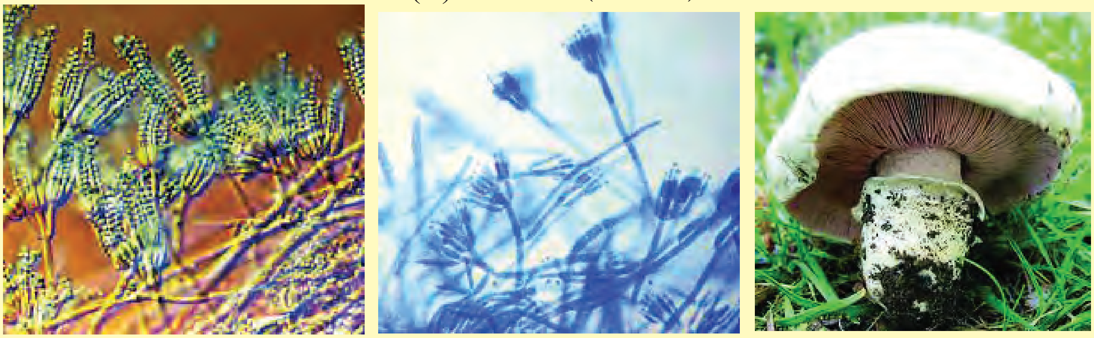

(C) ছত্রাক (ফাংগি)

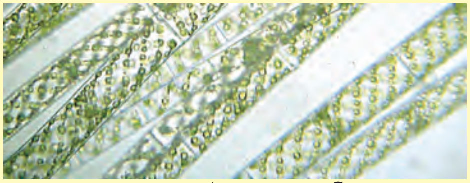
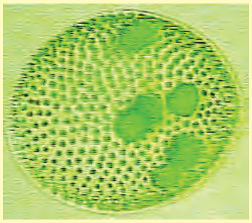

(D) শৈবাল (প্লান্টি)

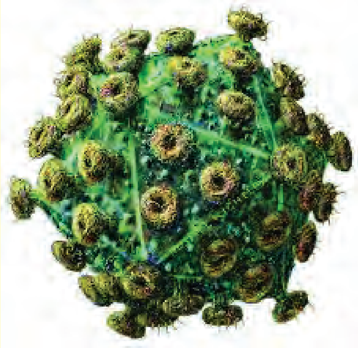
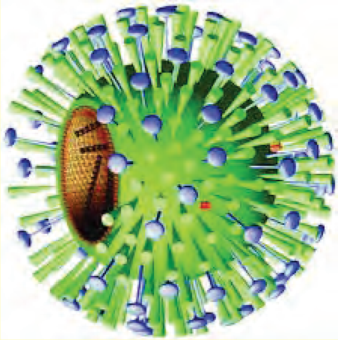

(E) ভাইরাস

ব্যাকটেরিয়া

- জীবজগতের কোশীয় জীবদের মধ্যে আকারে সবথেকে ছোটো ও কোশীয় গঠনের দিক থেকে সরলতম।
- এরা নানা আকারের হয় — কমা, রড, প্যাঁচানো স্ক্রু, বা গোলাকার।
- কোশপ্রাচীর থাকলেও উদ্ভিদ কোশের মতো নয়।
- প্রকৃত নিউক্লিয়াস থাকে না, পরিবর্তে প্যাঁচানো DNA থাকে।
- একক পর্দা দিয়ে ঘেরা কোনো অঙ্গাণু (যেমন-মাইটোকনড্রিয়া, লাইসোজোম, প্লাস্টিড ইত্যাদি) থাকে না। তবে পর্দাবিহীন অঙ্গাণু রাইবোজোম থাকে।

টুকরো কথা

লুই পাস্তুর

1674 সালে আন্তন ফন লিভেনহিক নামে হল্যান্ডের এক লেন্স ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুতকারক সর্বপ্রথম নিজের তৈরি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর জলাতঙ্কের টিকা ও জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কখ নানা রোগসৃষ্টিতে (যক্ষ্মা ও কলেরা) ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা আবিষ্কার করেন। এরেনবার্গ (1828) ব্যাকটেরিয়া শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। বর্তমানে ব্যাকটেরিয়াকে 'মোনেরা' গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়।

রবার্ট কখ

আদ্যপ্রাণী

- এদের দেহ একটিমাত্র কোশ নিয়ে গঠিত। এদের এখন প্রোটিস্টা বলা হয়। কোশে এক বা একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে।
- এরা নানা আকারের হয় — গোলাকার, ডিম্বাকার, লম্বা বা থালার মতো।
- এরা স্বাধীনভাবে একা থাকে। আবার অনেকে মিলে একসঙ্গে থাকে। আবার কেউ কেউ পোষক কোশের মধ্যে থেকে নানা রোগ সৃষ্টি করে।
- এরা নানাভাবে চলাচল করে। কারো দেহে ক্ষণপদ, আবার কারোর দেহে চাবুকের মতো ফ্ল্যাজেলা বা চুলের মতো সিলিয়া থাকে।

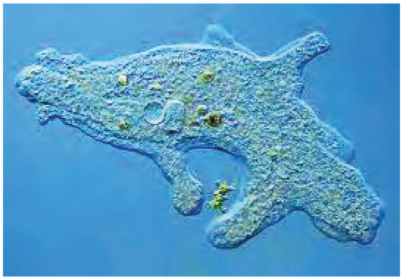

অ্যামিবা

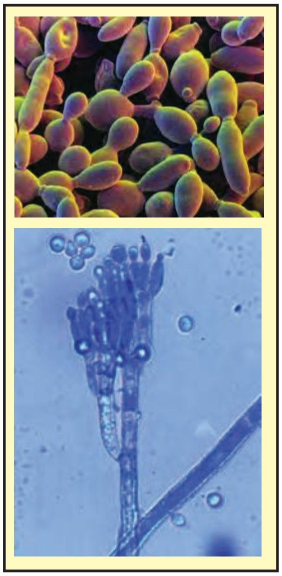

ওপরে ইস্ট ও নীচে পেনিসিলিয়াম

ছত্রাক

- এদের দেহকে মূল, কান্ড বা পাতায় আলাদা করা যায় না।
- এদের দেহ এককোশী গোলাকার (ইস্ট) বা সরু সুতোর মতো অংশ দিয়ে তৈরি। এই সুতোর মতো অংশের নাম হলো হাইফি। হাইফি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শাখাপ্রশাখায় ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে জট পাকিয়ে মাইসেলিয়াম নামে একরকম গঠন তৈরি করে। মিউকর, পেনিসিলিয়াম ছত্রাকে এই ধরনের গঠন দেখা যায়। 194 পৃষ্ঠার ছত্রাকের ছবিগুলোতে প্রথম দুটি ছত্রাক আণুবীক্ষণিক এবং তৃতীয় ছত্রাকটি খালি চোখে দেখা যায়।
- এদের কোশে কোশপ্রাচীর, নিউক্লিয়াস, নানা অঙ্গাণু থাকলেও ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না। তাই এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না।
- এদের কোশপ্রাচীর সবুজ উদ্ভিদের কোশের মতো নয়।
- এরা জলে, স্থলে, আলোর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে থাকতে পারে।

শৈবাল

- এদের দেহকেও ছত্রাকের মতো মূল, কাণ্ড বা পাতায় আলাদা করা যায় না।
- এদের দেহ এককোশী বা বহুকোশী। অনেকসময় একাধিক কোশ পরস্পর যুক্ত হয়ে বলের মতো গঠন তৈরি করে (এককোশী— ক্ল্যামাইডোমোনাস; এককোশী কিন্তু কোশগুলি পরস্পর যুক্ত— ভলভক্স; বহুকোশী — স্পাইরোগাইরা)।
- এদের কোশে কোশপ্রাচীর, নিউক্লিয়াস, নানা অঙ্গাণু থাকে। নানা আকৃতির ক্লোরোপ্লাস্ট থাকায় এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে।
- এদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য আলোর প্রয়োজন হয়।
- প্রধানত জলে থাকে।

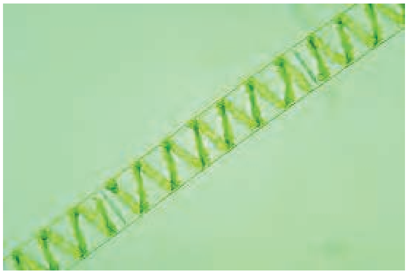

স্পাইরোগাইরা

ভাইরাস

এডওয়ার্ড জেনার

বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড জেনারের (1796) বসন্তরোগ সম্পর্কে গবেষণা থেকে আমরা ভাইরাসের কথা জানতে পারি। তবে 1940-এর দশকে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের আগে কোনো ভাইরাসকে দেখা সম্ভব হয়নি। সাধারণ অণুবীক্ষণে ভাইরাস দেখা যায় না। ভাইরাস কথাটির শব্দগত অর্থ হলো বিষ।

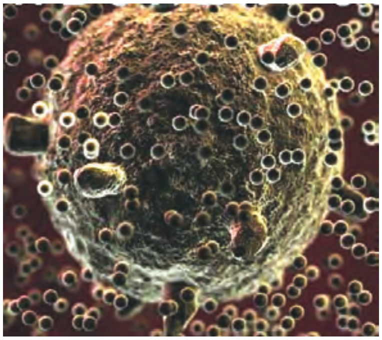

চিকেন পক্স ভাইরাস

- এদের কোনোরকম কোশীয় গঠন নেই।
- এদের কোনো কোশ আবরণী, সাইটোপ্লাজম বা নিউক্লিয়াস থাকে না। পরিবর্তে বাইরে প্রোটিনের তৈরি খোলকের মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA বা RNA) থাকে।
- এরা সবাই পরজীবী বা রোগসৃষ্টিকারী। কেবলমাত্র পোষক জীবকোশে প্রবেশ করলে এদের মধ্যে জীবনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। আর পোষক কোশের বাইরে থাকার সময় এরা জড় বস্তুর মতো আচরণ করে। 195 পৃষ্ঠার (E) চিহ্নিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবি দুটি ভাইরাসের মডেল।

জীবজগতের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক (পরজীবী, মিথোজীবী ও মৃতজীবী)

মানুষসহ বিভিন্ন জীব প্রাণী ও উদ্ভিদদেহে যে নানা রোগের প্রকাশ দেখা যায় তা প্রধানত অণুজীবদের জন্য। বিভিন্ন প্রকার অণুজীব বায়ু, জল, খাদ্য বা রক্তের মাধ্যমে মানুষের বা অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে প্রবেশ করে নানা রোগ সৃষ্টি করে।

এখন দেখা যাক কোন ধরনের অণুজীব মানুষের দেহে কী ধরনের রোগ সৃষ্টি করে।

1) ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগ - যক্ষ্মা, কলেরা, ডায়ারিয়া, টাইফয়েড, টিটেনাস, হুপিংকাশি, ডিপথেরিয়া, নিউমোনিয়া ইত্যাদি।
2) ভাইরাসঘটিত রোগ - ইনফ্লুয়েঞ্জা, পক্স , মাম্পস, মিসলস (হাম), পোলিও, জলাতঙ্ক, হেপাটাইটিস, ডেঙ্গুজ্বর, AIDS ইত্যাদি।
3) আদ্যপ্রাণীঘটিত রোগ - অ্যামিবিয়াসিস, জিয়ার্ডিয়াসিস, ম্যালেরিয়া, স্লিপিং সিকনেস, কালাজ্বর ইত্যাদি।
4) ছত্রাকঘটিত রোগ - দাদ, হাজা, ছুলি, অ্যালার্জি, নাক, মুখ, কান, গলা বা ফুসফুসে রোগ, খাদ্য বিষাক্তকরণ।

   কতকগুলো রঙিন ছত্রাক খুব বিষাক্ত ধরনের। এধরনের ছত্রাক যদি কোনো মানুষ ভুল করে খান তবে বমি, পাতলা পায়খানা, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

মানুষের দেহে কোন কোন পথ দিয়ে কোন কোন রোগের অণুজীব প্রবেশ করে তার একটা তালিকা তৈরি করো।

(1) পানীয় জলের মাধ্যমে — ডায়ারিয়া........
(2) হাঁচি কাশির সময় সংক্রামিত বায়ুর শ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে — যক্ষ্মা ....
(3) খাদ্যের মাধ্যমে —অ্যামিবিয়াসিস............. (4) রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে — হেপাটাইটিস ....
(5) বাহকের মাধ্যমে — ম্যালেরিয়া..........................
(6) অন্যান্যভাবে — AIDS.......................

টুকরো কথা

জীবজগতের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক

কোনো কোনো রোগের জীবাণু (যেমন- ম্যালেরিয়ার জীবাণু) জীবদেহে প্রবেশের পর বিভিন্ন অঙ্গের কোশের মধ্যে প্রবেশ করে। তারপর খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে ওই কোশের বা অঙ্গের বা জীবদেহের ওপর নির্ভরশীল থাকে। অর্থাৎ এরা স্বাধীনভাবে একা একা বেঁচে থাকতে পারে না। কোশের মধ্যে প্রবেশ করলে কোশের নানা অঙ্গাণুর কাজে এরা বাধা সৃষ্টি করে। ফলে পোষকের দেহের স্বাভাবিক ছন্দ নষ্ট হয়, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। পোষক জীবদেহের সঙ্গে অণুজীবদের এরকম সম্পর্ক হলো পরজীবিতা (Parasitism)।

আবার অনেকসময় দেখা যায় এই অণুজীবদের কেউ কেউ পোষক জীবদেহে থাকলেও তার কোনো ক্ষতি করে না। পরিবর্তে পোষক জীবদেহে নানাভাবে উপকার করে। 1888 সালে বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেন যে সিম, মটর জাতীয় উদ্ভিদের চাষ করার সময় যদি মাটিতে নাইট্রোজেন বা অ্যামোনিয়া সার না দেওয়া হয় তাহলেও এদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় না।

তোমরা লক্ষ করে থাকবে কোনো ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে তিনি তাকে রোগ অনুযায়ী নানা ওষুধ খেতে দেন। ওষুধের মধ্যে যেমন ওই রোগের জীবাণুকে মারার ওষুধ থাকে আবার B কমপ্লেক্স জাতীয় ভিটামিনও থাকে। এখন প্রশ্ন হলো ডাক্তারবাবু কী ওই ব্যক্তির মধ্যে ভিটামিনের অভাব লক্ষ করেছিলেন না অন্য কোনো কারণে তাকে ভিটামিন খেতে দিলেন?

অনেক গবেষণার পর দেখা গেছে মানুষের দেহের ক্ষুদ্রান্ত্রে একধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে যারা ভিটামিন B_{12} তৈরি করে। আমাদের রক্তের কোশ লোহিত রক্তকণিকার ভেতরে থাকা হিমোগ্লোবিন তৈরিতে এই ভিটামিন কাজে লাগে। এখন অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খেলে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া যেমন মারা যায়, তেমনি অন্ত্রের এই ব্যাকটেরিয়াও মারা যায়। তখন হঠাৎ করে ভিটামিনের অভাব দেখা দিতে পারে।

রাইজোবিয়াম ও মটর গাছের মূলের অর্বুদ

ডাল জাতীয় গাছের মূলের অর্বুদে রাইজোবিয়াম এবং এশ্চেরিচিয়া কোলাই ব্যাকটেরিয়ার মতো অণুজীবরা মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে থেকে আশ্রয় ও পুষ্টি গ্রহণ করে। পরিবর্তে রাইজোবিয়াম বায়ুর নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে যৌগ তৈরি করে মটর গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে বা এশ্চেরিচিয়া কোলাই মানুষের দেহের প্রয়োজনীয় ভিটামিন B_{12} সরবরাহ করে।

অনেকসময় একাধিক অণুজীব একে অপরের সঙ্গে সহাবস্থান করে পুষ্টি বিনিময় করে। শৈবাল ও ছত্রাক এরকম পাশাপাশি থাকে। ছত্রাক জল ও অজৈব লবণ শোষণ করে শৈবালদের দেয়। আর শৈবালরা ওই পুষ্টিরস ব্যবহার করে নিজেদের দেহে খাদ্য তৈরি করে। ওই খাদ্যের কিছু অংশ ছত্রাকরা ব্যবহার করে। শৈবাল ও ছত্রাকের এরকম সহাবস্থানই হলো লাইকেন। এও একধরনের মিথোজীবিতা।

টুকরো কথা

জীবজগতের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক

মটরগাছের মূলের অর্বুদে থাকা রাইজোবিয়াম বা মানুষের অন্ত্রে থাকা *Escherichia coli* ব্যাকটেরিয়ার পোষক দেহের সঙ্গে ক্ষতি না করে সহাবস্থানের মাধ্যমে থাকার এই পদ্ধতিই হলো মিথোজীবিতা (Symbiosis)।